বিশেষ সংখ্যা

আগস্ট ২০১৮ - শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৫

সচিত্র বাংলাদেশ

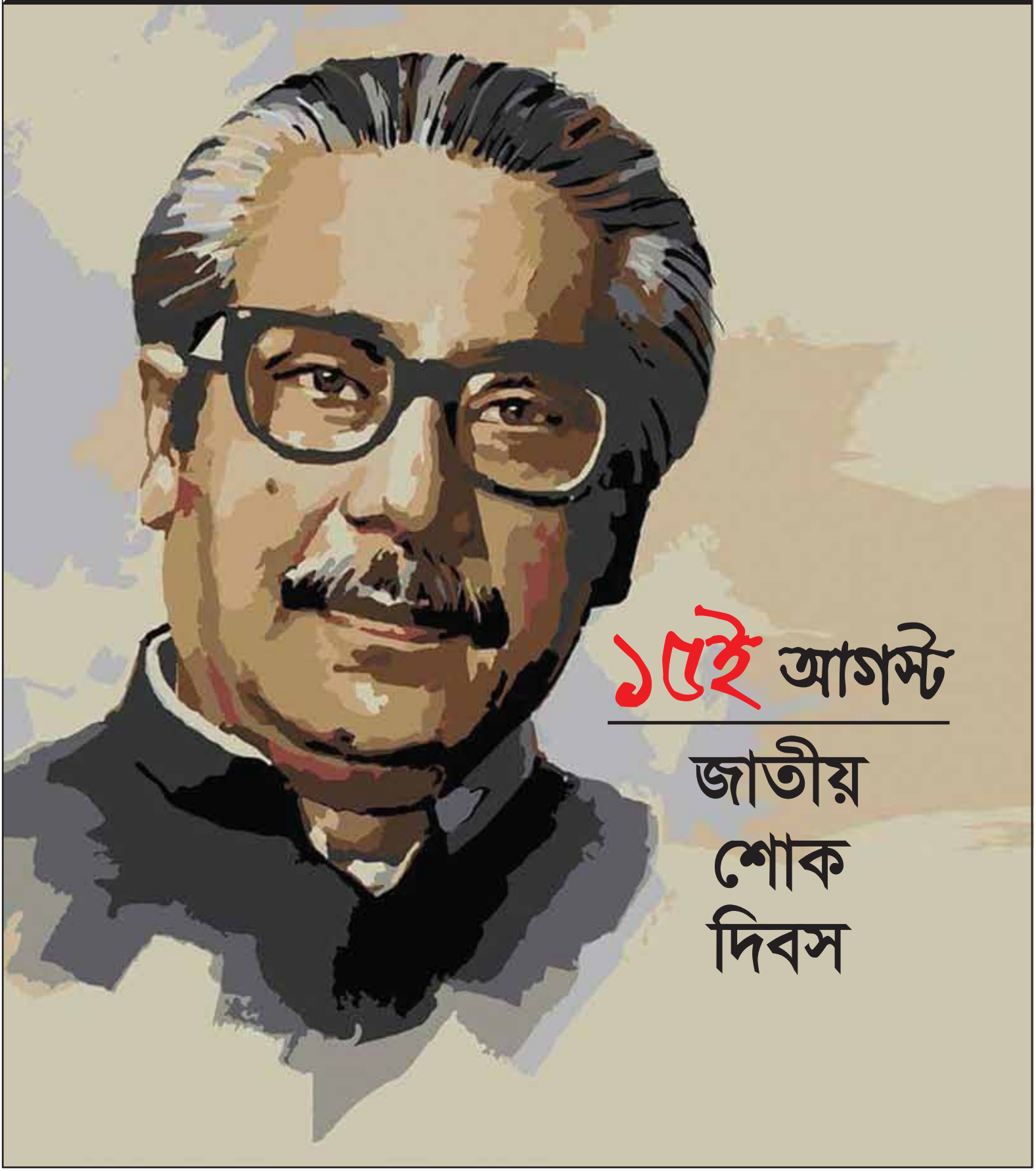

১৫ই আগস্ট

জাতীয় শোক দিবস

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

- যে-কোনো বিষয়ে লেখা পাঠানো যায়।
- লেখা সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। লেখার সাথে চিত্র দেওয়া হলে তা ক্যাপশনসহ প্রেরণ করা আবশ্যক।
- প্রতিটি লেখার জন্য লেখক সম্মানী দেওয়া হয়।
- হার্ডকপির সাথে সিডি বা ই-মেইলে লেখা পাঠানো হলে তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য।
- e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
  dfpsb@yahoo.com

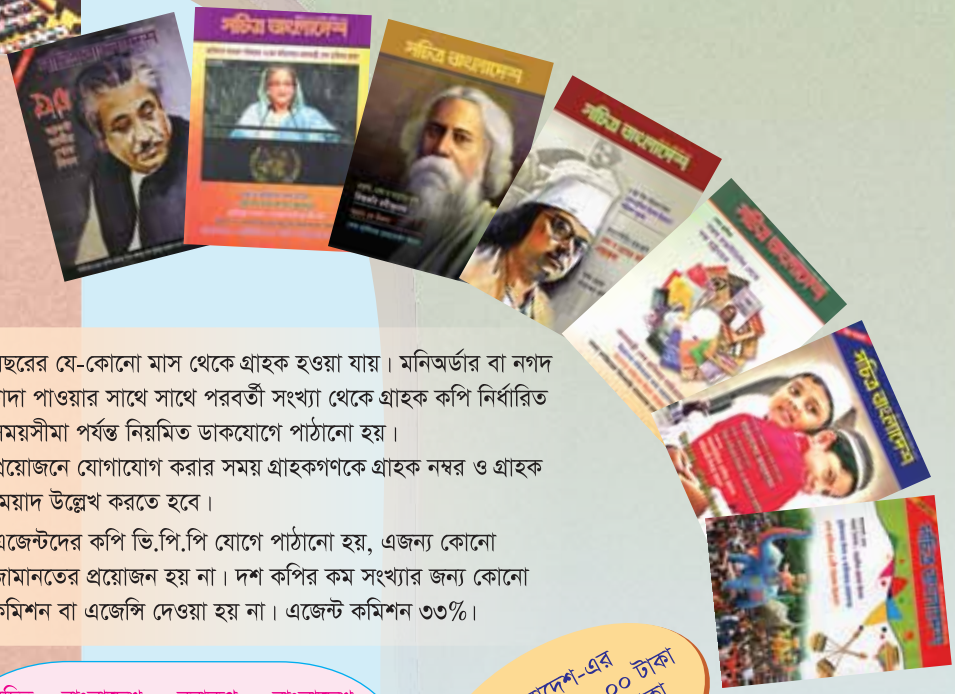

- বছরের যে-কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হয়।
- প্রয়োজনে যোগাযোগ করার সময় গ্রাহকগণকে গ্রাহক নম্বর ও গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করতে হবে।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি.পি যোগে পাঠানো হয়, এজন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্ট কমিশন ৩৩%।

সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহ সহজে পেতে এই **০১৫৩১৩৮৫১৭৫** বিকাশ নম্বরে যোগাযোগ করে টাকা পাঠিয়ে দিন।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : **bangladeshquarterly@yahoo.com**
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহ সহজে পেতে এই **০১৫৩১৩৮৫১৭৫** বিকাশ নম্বরে যোগাযোগ করে টাকা পাঠিয়ে দিন।

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 39, No. 02, August 2018, Tk. 25.00

টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার স্মৃতিসৌধ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা।

সচিত্র বাংলাদেশ - শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৫ - আগস্ট ২০১৮

সচিত্র বাংলাদেশ

আগস্ট ২০১৮ ❑ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৫

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর, ধানমন্ডি, ঢাকা

সম্পাদকীয়

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৩তম শাহাদত বার্ষিকী। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট প্রত্যুষে ঘাতক দালালদের বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার শহিদ হন। যে হৃদয়ে বাংলার মাটি ও মানুষের জন্য অফুরন্ত ভালোবাসা সঞ্চিত ছিল, নরপিশাচদের নারকীয় তাণ্ডবে বুলেটের আঘাত মুহূর্তের মধ্যে তা ঝাঁঝরা করে দেয়। যে সিংহপুরুষ মৃত্যুকে তুচ্ছ করে বিজয়ের পতাকা ছিনিয়ে এনে দীর্ঘকালের পরাধীন একটি জাতিকে স্বাধীনতার সোনালি সূর্য উপহার দিয়েছিলেন সে জাতিরই বিপথগামী কিছু সেনা সদস্যের শঠতায় তাঁর রক্তাক্ত দেহটি লুটিয়ে পড়ে তাঁরই স্বপ্নের সোনার বাংলার মাটিতে।

সেদিন নরঘাতকদের দলটি শুধু রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা হত্যা করে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা, বঙ্গবন্ধুর তিন পুত্র– শেখ কামাল, শেখ জামাল, ছোট্ট শিশু শেখ রাসেল, দুই পুত্রবধূসহ একে একে বঙ্গবন্ধু পরিবারের ১৮ সদস্যকে। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ৪৩তম শাহাদত বার্ষিকীতে *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

৭ই আগস্ট ছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭৭তম মৃত্যুবার্ষিকী। কবিতা, গান, ছোটোগল্প, উপন্যাস রচনায় কবির বিস্ময়কর বহুমুখী প্রতিভা বাংলা সাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধ, এনে দিয়েছে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির গৌরব। প্রতিভাধর এ মানুষটি যে চিত্রশিল্পীও ছিলেন তা আমরা কজনই বা জানি? সচিত্র বাংলাদেশের এ সংখ্যায় চিত্রকর হিসেবে কবিগুরু কেমন ছিলেন সে বিষয়ে একটি নিবন্ধ রয়েছে।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী ২৯শে আগস্ট। প্রেম, দ্রোহ ও মানবতার কবি কাজী নজরুল ইসলামকে অসুস্থ অবস্থায় ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ফিরিয়ে এনে জাতীয় কবির মর্যাদা দেন। জাতীয় কবিকে নিয়ে এ সংখ্যায় রয়েছে বিশেষ নিবন্ধ।

শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশে মাতৃদুগ্ধের কোনো বিকল্প নেই। আগস্টের প্রথম সপ্তাহটি আমরা 'বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ' হিসেবে পালন করেছি। এ বিষয়ে ফিচার ছাড়াও গল্প, কবিতা ও নিয়মিত বিভাগ দিয়ে সাজানো হয়েছে এবারের *সচিত্র বাংলাদেশ*। আশা করি, শোক দিবসকে ঘিরে এ বিশেষ সংখ্যা আপনাদের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মো: এনামুল কবীর

সম্পাদক
সুফিয়া বেগম
নাফেয়ালা নাসরিন

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
সুলতানা বেগম

সহ-সম্পাদক
সাবিনা ইয়াসমিন
জান্নাতে রোজী

সম্পাদনা সহযোগী
শারমিন সুলতানা শান্তা
জান্নাত হোসেন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

ব্যাক কভার পেজ অলংকরণ
এইচ কে বর্মণ

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৪৯৩৫৭৯৩৬ (সম্পাদক), ৯৩৩২০১১
E-mail : editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৪২

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষান্মাষিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা।
নিয়মিত গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : **সহকারী পরিচালক** (বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর; **স্থানীয় এজেন্ট এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।**

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
সূচিপত্র

নিবন্ধ/প্রবন্ধ

টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার স্মৃতিসৌধ ৪
আখতার হামিদ খান

বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ ৬
কমল চৌধুরী

অসমাপ্ত আত্মজীবনী এবং দুই মানব প্রতিকৃতি ৮
মফিদুল হক

বঙ্গবন্ধু: দুখি মানুষের স্বপ্নদ্রষ্টা ১০
সেলিনা হোসেন

বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয় ১২
খালেক বিন জয়েনউদদীন

কীর্তিমানের মৃত্যু নেই ১৪
বীরেন মুখার্জী

স্বপ্নদ্রষ্টা শেখ মুজিব ১৬
বরুণ দাস

বঙ্গবন্ধুর প্রিয় পঙ্‌ক্তিমালা ১৮
অনুপম হায়াৎ

বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের ইতিকথা ২০
জয়া সূত্রধর

বঙ্গবন্ধুর মতোই কিংবদন্তি যে ভূষণ ২২
রহিমা আক্তার মৌ

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা ২৪
মোনাজিনা জান্নাত

কুরবানি: তাৎপর্য ও আহকাম ২৬
মুফতি আবুল হাসান শরীয়তপুরী

রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প ৩০
ম. মীজানুর রহমান

জাতীয় কবির নজরুল গীতি ৩২
আতিক আজিজ

মায়ের দুধ পান: সুস্থ জীবনের বুনিয়াদ ৩৫
সুলতানা বেগম

জ্বালানি নিরাপত্তা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ৩৬
রোজি আক্তার

হাইলাইটস

গল্প

শোক দিবসের অধ্যাস ৩৯
রফিকুর রশীদ

কবিতাগুচ্ছ ৩৪, ৩৮, ৪২, ৪৩
কাজী রোজী, সোহরাব পাশা, শাফিকুর রাহী
মোশাররফ হোসেন ভূঞা, সুহৃদ সরকার
মনসুর জোয়ারদার, দুখু বাঙাল, সাঈদ তপু
মীর জামাল উদ্দিন, নুরুন্নাহার নাজমা
আ. আউয়াল রণী, মোহাম্মদ সেলিম রেজা
নূরুল হক, কাজী সুফিয়া আখতার, পারভীন আক্তার লাভলী

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪৪
প্রধানমন্ত্রী ৪৫
তথ্য মন্ত্রণালয় ৪৭
জাতীয় ঘটনা ৪৯
আন্তর্জাতিক ৫০
উন্নয়ন ৫১
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫২
শিল্প-বাণিজ্য ৫৩
শিক্ষা ৫৪
কৃষি ৫৫
নারী ৫৬
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৭
সামাজিক নিরাপত্তা ৫৭
নিরাপদ সড়ক ৫৮
যোগাযোগ ৫৮
মাদক প্রতিরোধ ৫৯
স্বাস্থ্যকথা ৫৯
প্রতিবন্ধী ৬০
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৬১
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৬১
সংস্কৃতি ৬১
চলচ্চিত্র ৬২
ক্রীড়া ৬৩
বিশ্বজুড়ে আগস্ট: স্মরণীয় ও বরণীয় ৬৪

টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার স্মৃতিসৌধ

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা, বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের রাজা। তিনি আজ ঘুমিয়ে আছেন। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতাবিরোধী কুচক্রীরা তাঁকে জোর করে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। যিনি ছিলেন আমাদের প্রাণের নেতা, তিনি আজ সমস্ত বাঙালির ভালোবাসা নিয়ে ঘুমিয়ে আছেন গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার সমাধিসৌধে। '৭৫-এর ১৫ই আগস্টের পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধুকে সমাধিস্থ করার বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে লিখেছেন আখতার হামিদ খান। এ বিষয়ে নিবন্ধ পড়ুন, পৃষ্ঠা-৪

অসমাপ্ত আত্মজীবনী এবং দুই মানব প্রতিকৃতি

অসমাপ্ত আত্মজীবনী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনগাথা– যা তিনি জেলে বসে লিখেছিলেন। সাধারণ স্কুল ছাত্রদের মতো রুলটানা খাতায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাঁর জীবনের স্মৃতি। সেখানে তিনি বহু মানুষের স্মৃতিচারণ করেছেন। তাঁর স্মৃতিতে উঠে এসেছে গোপালগঞ্জের রামদিয়ার স্বদেশি যুগের সমাজসেবক চন্দ্র ঘোষ এবং বিহার থেকে আগত উদ্বাস্তু উর্দুভাষী লেখক ইবনে হাসানের কথা। এ দুজন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে বঙ্গবন্ধুকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাই তাদের কাছ থেকে আমাদের জন্য বঙ্গবন্ধুকে জানার অনেক বিষয় ছিল। আজ তারা নেই, তাই তা আমরা জানতে পারিনি। এ আক্ষেপের সুর বেজে ওঠে মফিদুল হকের প্রবন্ধে। দেখুন, পৃষ্ঠা-৮

বঙ্গবন্ধু: দুখি মানুষের স্বপ্নদ্রষ্টা

বঙ্গবন্ধু কিশোর বয়স থেকেই সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করার স্বপ্ন দেখতেন। তাইতো সাহসের সঙ্গে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বার বার তিনি মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রসারিত। সমগ্র মানবজাতি নিয়েই তিনি ভাবতেন। বঙ্গবন্ধুর এই মানবতার দর্শনই তাঁকে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছিল, তারাও জীবনকে ঘিরে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে লেখা সেলিনা হোসেনের প্রবন্ধ পড়ুন, পৃষ্ঠা-১০

কুরবানি: তাৎপর্য ও আহকাম

ইসলামি শরিয়ত মোতাবেক কুরবানি একটি ইবাদত। পবিত্র ঈদুল আজহার দিনগুলোতে নির্দিষ্ট প্রকারের গৃহপালিত পশু আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য জবেহ করাই হলো কুরবানি। যার উপর সদকা আদায় করা ওয়াজিব তার উপর কুরবানি করাও ওয়াজিব। তাই কুরবানি কবুল হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কুরবানির ফজিলত, পশু নির্বাচন ও বিভিন্ন বর্জনীয় দিকসহ গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা সম্পর্কে জানতে মুফতি আবুল হাসান শরিয়তপুরীর নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-২৬

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : রূপা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৭১৯৪৭২০

নিবন্ধ

টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার স্মৃতিসৌধ

আখতার হামিদ খান

[কোনো স্বার্থ তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। ছুঁতে পারেনি কোনো লোভ। এমনকি মৃত্যুর পরও অনন্যসাধারণভাবে তাঁকে বিদায় জানানো হয়। তাঁর লাশ কলুষিত করতে চেয়েছিল '৭১- এর খুনি চক্র। তাদের ভয় ছিল বঙ্গবন্ধুর লাশকেও। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাটি চাপা দিতে চেয়েছিল। সেই সময় খুনিদের বন্দুকের নলের সামনে বাংলাদেশ থমকে গেলেও মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় টুঙ্গিপাড়ার কয়েকজন সাহসী সাধারণ মানুষ। সেই সাহসী মানুষদের জন্য বাঙালি জাতি আজ পেয়েছে বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ।]

খোকা তখন গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলের ছাত্র। সপ্তম শ্রেণিতে পড়ালেখা করছেন। স্কুল পরিদর্শনে এলেন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক এবং খাদ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। স্কুল পরিদর্শন শেষে তাঁরা ফিরে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁদের পথ আটকে দাঁড়ান খোকা। সপ্তম শ্রেণির একজন ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমান। সবাই বিস্মিত। স্কুল শিক্ষক আর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গও একটু বিব্রত। কেন এই ছাত্র বিশাল দুই ব্যক্তির পথ আটকালেন? কোনো দ্বিধা বা জড়তা ছাড়াই খোকা দাবি করে বসল– স্কুলে ছাত্রাবাসের ছাদ দিয়ে পানি পড়ে, ছাদ মেরামতের ব্যবস্থা না করে আপনারা যেতে পারবেন না। কিশোরের সাহস দেখে মুগ্ধ হলেন শেরেবাংলা ফজলুল হক। জানতে চাইলেন, ছাত্রাবাস মেরামত করতে কত টাকা লাগবে। খোকা উত্তর দিলেন, বারোশ টাকা।

এ ঘটনার পর স্কুলের ছাত্রাবাসটি মেরামত করা হয়।

এর কিছুদিন পরের ঘটনা। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে ভালো ফসল হয়নি। কৃষকের ঘরে হাহাকার। ঘরে চাল নেই, ধান নেই। খোকা দেখলেন তাঁদের গোলা ভরা ধান রয়েছে। ডেকে নিয়ে এলেন অভুক্ত কৃষকদের। গোলা উজাড় করে তাদের মধ্যে ধান বিলিয়ে দিলেন। বাবা শেখ লুৎফর রহমান এ ঘটনা জানতে পেরে খোকাকে বকলেন এবং এর কারণ জানতে চাইলেন। তখন খোকার স্পষ্ট জবাব, গরিবের পেট আছে। আমাদের মতো ওদেরও ক্ষুধা লাগে, আমাদের বেশি ছিল তাই দিয়েছি। খোকার এই দৃঢ় উত্তর শুনে বাবা মুগ্ধ হলেন।

এসবের আগের আরো একটি ঘটনা। তখন খোকা মাত্র চতুর্থ শ্রেণিতে উঠেছে। মাঘ মাসের শীত। সহপাঠীদের সঙ্গে স্কুল থেকে ফিরছিলেন। দেখলেন বড়ো রাস্তার মোড়ে এক বৃদ্ধ ফকির শীতে কাঁপছে। আর কান্না জড়ানো কণ্ঠে ভিক্ষা চাইছে। বৃদ্ধের শীর্ণ শরীর খালি গা। গায়ের হাড্ডিগুলোও বেরিয়ে এসেছে। লোকজন দাঁড়িয়ে বৃদ্ধের অবস্থা দেখছে। কেউ দুয়েক পয়সা দিয়ে সমবেদনা জানাচ্ছে। খোকা বন্ধুদের নিয়ে থমকে দাঁড়ায়। নিজের চাদরটি মুহূর্তেই খুলে বৃদ্ধের গায়ে জড়িয়ে দেয়। সবাই তো অবাক। এরপর খোকা হনহন করে বাড়ির দিকে হাঁটা দেয়। পেছনে একবারও তাকায় না। বৃদ্ধের কান্না থেমে যায়। হাত তুলে দোয়া করেন। ভাঙা ভাঙা কণ্ঠে বলেন, বড়ো হও বাবা, আল্লাহ তোমারে বাঁচায়ে রাখুক। অনেক বড়ো হও তুমি, রাজা হও। সত্যি সত্যি সেই খোকা একটি দেশের রাজা হয়। কেবল তাই নয়, একটি স্বাধীন ভূখণ্ড আর একটি জাতির জন্মদাতা হন। হন সমগ্র বাঙালি জাতির বন্ধু, জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান। সেই রাজা এখন ঘুমিয়ে আছেন। তাঁকে জোর করে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই তিনি আজ ঘুমিয়ে আছেন টুঙ্গিপাড়ার সমাধিসৌধে। সব বাঙালির আকণ্ঠ ভালোবাসা নিয়ে।

টুঙ্গিপাড়ায় কালরাত্রির পরের দিন

বঙ্গবন্ধু সপরিবার নিহত হবার দুঃসংবাদটি টুঙ্গিপাড়ায় প্রথম পৌঁছে রেডিওর মাধ্যমে। তখন ১৯৭৫ সাল, ১৬ই আগস্টের সকাল। এ সম্পর্কে নওয়াব আলী জানালেন, খুব সকালবেলা ওয়্যারলেসের মাধ্যমে খবর আসে ১০টি কবর খুঁড়ে রাখার। ১০টি কবর? ওয়্যারলেস মেসেজটি সমগ্র বাংলাদেশের মতো টুঙ্গিপাড়ায়ও ভীতি সঞ্চার করে। এরপর আবার ওয়্যারলেস মেসেজ। এবার বলা হয় ৬টি কবর খুঁড়ে রাখতে। তখন সকাল প্রায় ৯টা। কিন্তু মেসেজ অনুযায়ী কোনো কবর তখন খোঁড়া হয়নি। কেননা কবরের স্থান নিয়ে একটি সমস্যা হচ্ছিল। শেখ পরিবারের পারিবারিক কবরস্থান বাড়ি থেকে একটু দূরে। পাটগাতী বাসস্ট্যান্ডে যাবার পথের ধারে। কিন্তু তখন কেউ বুঝতে পারেনি টুঙ্গিপাড়ায় কাকে কবর দেওয়া হবে।

এরপর সকাল ১০টা কী সাড়ে ১০টার দিকে খবর আসে ১টি কবর খুঁড়ে রাখতে হবে। তখন আর কারো বুঝতে বাকি ছিল না সেটি কার কবর হবে। ঠিক হয় পারিবারিক গোরস্থান নয়; বঙ্গবন্ধুর বাড়ির উঠানে যেখানে তাঁর প্রিয় মা-বাবা সমাহিত। তার পাশেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কবর হবে। তবে যারা কবর খুঁড়েছিলেন তারা বাবা শেখ লুৎফর রহমানের ডান পাশে অর্থাৎ শেখ মুজিবের বাম পাশে একটি কবরের জায়গা খালি রেখে স্থান নির্বাচন করেছিলেন। কেননা শেখ লুৎফর রহমানের স্ত্রী সাহেরা খাতুনকে স্বামীর বাম পাশে কবর দেওয়া হয়। তাই তখন যারা কবর খোঁড়ার কাজ করছিলেন তারা ভেবেছিলেন যদি বেগম মুজিবকেও কবর দেওয়া হয় তবে তা যেন স্বামী শেখ মুজিবুর রহমানের বাম পাশে হয়।

নওয়াব আলী সেসময় কবর খুঁড়তে পারেননি। অনেক চেষ্টা করেছিলেন

কিন্তু বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে ঢুকতে পারেননি। টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুকে কবর দেওয়া হবে বলে সমগ্র এলাকা ফাঁকা করে দেওয়া হয়। পুলিশ কর্ডন বসায়। নওয়াব আলী দূর থেকে দেখেছেন। তখন দূর থেকে দেখলেও পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুর কবরের কেয়ার টেকার হিসেবে কাজ করেন। এখনো সে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন নওয়াব আলী।

দুপুরের দিকে আর্মি হেলিকপ্টারে করে বঙ্গবন্ধুর লাশ স্থানীয় থানার মাঠে নামানো হয়। লাশ পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে পুরো গ্রাম ফাঁকা করে দেওয়া হয়। এরপর ইমান উদ্দিন, আব্দুল মন্নাফ, নুরুল হক, গেদু মিয়া, কেরামত কাজী, রজব আলী, আব্দুল হাই, নজির মোল্লা, তোতা মিয়া, দর্জি, ইদ্রিস কাজী, কাসেম হাজী, জহুর মুন্সি, আব্দুল হালিম মৌলবি ছাড়া বঙ্গবন্ধুপ্রেমী আর কেউ ছিল না। তবে ছিল চারপাশের প্রকৃতি। যেখান থেকে একটু একটু করে একজন খোকা জাতির পিতা হয়। সেই প্রকৃতিও থমকে দাঁড়িয়ে দেখেছে লাশ নিয়েও মানুষরূপী কিছু পশুর কীর্তিকলাপ।

হেলিকপ্টার থেকে কফিনের বাক্স কাঁধে করে নির্দিষ্ট খোঁড়া কবরের পাশে নামানো হয়। একজন স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রধারী সেনা সদস্য বলে কফিনসহ মাটি চাপা দিতে। তখন স্থানীয় মসজিদের ইমাম আব্দুল হালিম মৌলবি বলেন, বাক্সে কী আছে তা না দেখে আমরা কবরে নামাতে পারি না। তা করলে শরিয়ত বিরোধী কাজ হবে। এটা মানতে রাজি ছিল না খুনি চক্রের দল। এই বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর অনুসারীরা অটল থাকায় সেনা সদস্য কফিন খোলার হুকুম দেয়। কফিনের ডালা উন্মুক্ত করতেই সবাই আঁতকে উঠেন। এ দৃশ্য দেখার কথা টুঙ্গিপাড়ার কেউ কোনোদিন ভাবতেও পারেনি। রক্তমাখা বঙ্গবন্ধুর লাশ। পেটের দিকটায় রক্ত ছাড়া আর কিছু নেই যেন। ভেতরটা কেঁদে উঠলেও কেউ তা প্রকাশ করতে পারেনি। সেনারা হুকুম দেয়– লাশ দেখেছ, এবার কবরে নামাও। এ হুকুমও মানেনি উপস্থিত টুঙ্গিপাড়ার বাসিন্দারা। আব্দুল হালিম মৌলবি যেন আরো কৌসুলি। আর্মি অফিসারকে উদ্দেশ্য করে বলেন, কোনো মুসলমানের লাশ গোসল এবং জানাজা না পড়িয়ে কবরে নামানো যাবে না। আর যদি গোসল ছাড়া নামাতে হয় তবে আপনাদের লিখে দিতে হবে যে, বঙ্গবন্ধু শহিদ হয়েছেন। শহিদের লাশ গোসল, জানাজা ছাড়াই কবর দেওয়া যায়। এমন অবস্থায় খুনিদের একজন অফিসার বলেন, ঠিক আছে গোসল করান। তবে আপনাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে। ১০ মিনিটের মধ্যে সব শেষ করতে হবে।

আচ্ছা বলে দ্রুত সবাই কাজে লেগে গেলেন, স্থানীয় রেডক্রস অফিসের পিয়ন রজব আলী ছুটলেন গোসল করানোর সাবান আনতে। কিন্তু কোথায় গোসল করার সাবান? সাবান তখন ন্যায্যমূল্যের দোকানে বিক্রি হয়। সেটা বন্ধ। রজব আলী দ্রুত তৈয়ব আলী মাতুব্বরের দোকানে যান। নিয়ে আসেন কাপড় ধোয়ার ৫৭০ সাবান। আর নিয়ে আসেন তিন বালতি পানি।

তিনজন তাদের নেতাকে গোসল করান। গোসল করাতে গিয়ে দেখা যায় অধিকাংশ বুলেট বুকেই লেগেছে। তিনজনই বুলেটের চিহ্ন গুণেন। একজন গুণেন ২২টি। একজন গুণেন ২৬টি। আর আব্দুল মন্নাফ গুণে দেখেন ২৮টি। এরমধ্যে বুকে ২৪টি বুলেটের ক্ষত। ২৮টি ক্ষতচিহ্নের উলটো দিকে অর্থাৎ শরীরের পেছন দিকে মাত্র একটি চিহ্ন। হয়ত বুলেটগুলো শরীরের ভেতরেই রয়ে গেছে। কেবল তাই নয়, বঙ্গবন্ধুর দুই পায়ের রগ ছিল কাটা। আর ডান হাতের মধ্যমার কোনো চামড়া ছিল না। অথচ বঙ্গবন্ধুর মুখটি তখনও ছিল হাসিমাখা। চোখ জোড়া বন্ধ। যেন প্রশান্তিতে ঘুমাচ্ছেন। গোসল করানো শেষে নজির মোল্লা আর আব্দুল হাইয়ের নিয়ে আসা কাপড় দিয়ে কাফনের কাপড় বানানো হয়। স্থানীয় রেড ক্রিসেন্ট অফিস থেকে রিলিফের কাপড় এনে কাফনের কাপড় বানানো হয়। অতঃপর জানাজা শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে টুঙ্গিপাড়ায় যেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার একটু দূরে বাড়ির উঠানে চির নিদ্রায় শায়িত করা হয়। এভাবে একজন আকাশের সমান মানুষকে অনন্যসাধারণ উপায়ে প্রকৃতির হাতে তুলে দেওয়া হয়। মৃত্যুর পর শেষযাত্রায়ও বঙ্গবন্ধুকে কোনো স্বার্থ স্পর্শ করতে পারেনি।

এ প্রসঙ্গে নওয়াব আলী স্মৃতিচারণ করে বলেন, তখন ১৯৫৪ সাল। শেখ মুজিবুর রহমান পুরো পরিবার নিয়ে ঢাকায় যান। উঠেন পুরনো ঢাকার নারিন্দার একটি বাড়িতে। একথা জানতে পেরে সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবকে একটি জমি বরাদ্দ দেওয়ার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাব শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন, শেখ মুজিবের নামে কোনো স্বার্থ বাংলার মাটিতে লেখা হবে না। উল্লেখ্য, ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়ির জমিটি শেখ মুজিবকে না জানিয়েই বেগম মুজিবের নামে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল।

এরপর

সেদিন দুপুরের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর দাফন কাজ শেষ হলে পুরো টুঙ্গিপাড়া গ্রামটি জনশূন্য করে দেওয়া হয়। কেবল পাটগাতীর এক বুড়ি ব্যতীত গ্রামে আর কোনো মানুষ ছিল না। তবে ছিল পুলিশ আর আর্মি। আর্মি বঙ্গবন্ধুর পুরো বাড়ি ঘিরে রাখে। তবে পরের দিন থেকে বাড়ির বাইরের পরিবেশ একটু একটু করে স্বাভাবিক হতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর ছোটো ভাইয়ের স্ত্রী রিজিয়া বেগম এসে কিছু টাকা দিয়ে যান। সে টাকায় কড়া পাহাড়ায় মিলাদ হয়। এর সপ্তাহখানেক পরে ম্যাজিস্ট্রেট এসে সিজার লিস্ট করে এবং বঙ্গবন্ধুর বাড়িটি সিলগালা করে দেওয়া হয়। এভাবে অনেক দিন অব্যবহৃত অবস্থায় জনমানবশূন্য করে রাখা হয় বঙ্গবন্ধুর বাড়িটি। কেননা অপরাধ যে করে তার ভেতরে সব সময় ভয় কাজ করে। এ ভয় থেকেই বঙ্গবন্ধুর কবরটিও বাঙালির কাছ থেকে অনেক দূর রেখে দেওয়া হয়েছিল। এমনকি টুঙ্গিপাড়া নামটিও স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে মুছে ফেলার অনেক ষড়যন্ত্র হয়।

ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ছিল একটি সড়কও। বঙ্গবন্ধুর কবরের মাত্র তিন ফুট দূর দিয়ে একটি পাকা রাস্তা নির্মিত হচ্ছিল। পাকা সড়ক পথটি পাটগাতী বাজার থেকে উপজেলা কমপ্লেক্সের দিকে যাচ্ছিল। সেটির নির্মাণ বন্ধ হয়ে যায় তখন। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ সরকার এসে বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতি বাঙালির শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রক্ষার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। একটি মাস্টার প্ল্যানের আওতায় কেবল সমাধিসৌধ নয়, পুরো টুঙ্গিপাড়ার ঐতিহ্য রক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সমাধিসৌধকে বাইপাস করে একটি সড়ক নির্মিত হয়। এছাড়াও সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় তাদের নিজস্ব উদ্যোগে মাস্টার প্ল্যানের নানা কাজ স্বতন্ত্রভাবে শেষ করেছে।

১৯৯৪ সালের কথা। তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা কয়েকজন প্রকৌশলীকে নিয়ে টুঙ্গিপাড়ায় যান। প্রকৌশলীদের বলেন, বঙ্গবন্ধুর কবরটি ঘিরে একটি সৌধ নির্মাণ করতে।

পথটি যেদিক থেকে এসেছে তা উঠানের কবরগুলোর সঙ্গে কৌণিক অবস্থানে ছিল। যা অসংগতি তৈরি করছিল। এই অসংগতি দূর করার জন্য মূল সমাধিসৌধটিতে কংক্রিটের গোলাকার স্ক্রিন দিয়ে দেওয়া হয়। এই গোলাকার স্ক্রিনের চারপাশের স্থানটি আধ্যাত্মিক চত্বর বা স্পিরিচ্যুয়াল কোর্ট হিসেবে পরিচিত। এখানে এসে বঙ্গবন্ধুপ্রেমীরা নিজেকে একটি স্তরে নিয়ে যেতে পারবেন। এই কমপ্লেক্সে রয়েছে একটি পাঠাগার ও জাদুঘর। পাঠাগারে বঙ্গবন্ধু ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেখা বইসহ প্রায় ছয় হাজার বই রয়েছে। রয়েছে গবেষণা কেন্দ্র, প্রদর্শনী কেন্দ্র, উন্মুক্ত মঞ্চ, পাবলিক প্লাজা, প্রশাসনিক ভবন, ক্যাফেটেরিয়া, বকুলতলা চত্বর ও স্যুভেনির কর্নার।

প্রদর্শনী কেন্দ্রে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের নানা পর্যায়ের আলোকচিত্র ছাড়াও রয়েছে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা শিল্পকর্ম। এছাড়া মুক্তিসংগ্রামের নানা পর্যায়ের দেশ ও বিদেশ থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্র। বঙ্গবন্ধুকে যে কফিনে করে ঢাকা থেকে সামরিক হেলিকপ্টারে নিয়ে আসা হয়েছিল, সেটিও সংরক্ষণ করা হয়েছে সযত্নে। দর্শনার্থীরা এখানে এসে আবেগে আপ্লুত হন। শ্রদ্ধা জানান বঙ্গবন্ধুকে।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

তেজগাঁওয়ে শ্রমিক-জনতার মাঝে বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ

কমল চৌধুরী

পৃথিবীর প্রতিটি জাতির একজন পিতা থাকে। বাঙালির জাতির পিতা হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। প্রতিবিপ্লবী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে কখনোই মেনে নিতে পারেনি। তাই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক বঙ্গবন্ধুকে তারা নিশ্চিহ্ন করতে উদ্যত হয়েছিল দৈহিকভাবে। মুছে ফেলতে চেয়েছিল কোটি কোটি মানুষের হৃদয় থেকে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু চিরঞ্জীব ও অমর। তিনি চিরকাল বেঁচে থাকবেন ৫৫ হাজার বর্গমাইলের সবুজ-শ্যামল এই গাঙ্গেয় বদ্বীপে। বাংলাদেশের মতোই শাশ্বত চিরায়ত ও দেদীপ্যমান বঙ্গবন্ধুর অস্তিত্ব। এই সত্য বিস্মৃত হয়ে অপোগণ্ডের মতো যারা ইতিহাস বিকৃতির অপচেষ্টায় লিপ্ত, তারা বাস্তবিকই করুণার পাত্র। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম না হলে পৃথিবীর বুকে হয়ত একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ পেতাম না। তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মানেই স্বাধীনতা, শেখ মুজিব মানেই বাংলাদেশ। সে ইতিহাসই সত্য এবং নির্ভেজাল। আর সে ইতিহাসের কথা লিখতে গিয়ে আমরা কোনো ক্ষমতার মোহ নয়, আর্থিক লাভ নয়, শুধুই মানবিক কারণে লিখছি, লাখ লাখ মানুষের হত্যাযজ্ঞ আর মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের কষ্টার্জিত আর রক্তার্জিত স্বাধীনতা এবং একাত্তরের বিভীষিকাময় গণহত্যার দিনগুলোর কথা।

আমরা হারিয়েছি সহায়সম্পত্তি। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাতে কোনো মতানৈক্য, কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকতে পারে না। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বেই আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে লাখো মুক্তিকামী মানুষের সামনে যে ভাষণ দিয়ে সমগ্র দেশবাসীকে উদ্দীপ্ত আর সংগ্রামী করেছিলেন তিনি অন্য কেউ নন, তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা'– এরকম তেজোদ্দীপ্ত বাণী কেউ সেদিন ছড়াতে পারেনি। পাকিস্তানের সামরিক শক্তি যদি কোনো নেতাকে ভয় করে থাকে তা একমাত্র শেখ মুজিবুর রহমানকেই করেছে। ১৯৭১ সালের সেই ভয়াবহ যুদ্ধের দিনে সারা পৃথিবীর পত্রপত্রিকা বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের কথা তুলে ধরেছিল। সেদিন মুক্তিযোদ্ধারা জীবন বাজি রেখে যে সংগ্রাম করেছিল তা 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানে। সেদিন মুক্তিযোদ্ধা আর স্বাধীনতাকামী মানুষের পক্ষে স্লোগান তোলা হয়েছিল– 'তোমার নেতা আমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব', 'জেলের তালা ভাঙবো শেখ মুজিবকে আনবো'। তারপরও কি বলে দিতে হবে কে স্বাধীনতার মহানায়ক? কে স্বাধীনতার ঘোষক? 'বাংলাদেশ' নামক দেশটির প্রতিষ্ঠাতা কে? একটি দেশের জন্য, একটি জাতির জন্য, একটি ভাষার জন্য যে নেতা বছরের পর বছর জেল, জুলুম, নির্যাতন ভোগ করেছেন তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সুতরাং বঙ্গবন্ধু ছাড়া বাংলাদেশের কোনো সঠিক ইতিহাস তৈরি হতে পারে না। বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মহানায়ক ও ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু অপ্রিয় সত্য যে, স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতকরা তাঁকে বেঁচে থাকতে দেয়নি। কারণ শয়তান কখনো মানুষ হয় না। হায়েনারূপী পশুরা কখনো শ্রদ্ধা জানাতে জানে না। যার ফলে দেশ স্বাধীন হবার কিছুদিন পরেই স্বাধীনতা বিরোধী দেশি-বিদেশি ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিয়ে কোনো বিতর্ক থাকতে পারে না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবই বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা, স্বাধীনতার ঘোষক, বাংলা ভাষাভাষী মানুষের অবিসংবাদিত নেতা ও সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি।

বঙ্গবন্ধু এমন একজন নেতা যিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার পর বাঙালি জাতিকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে পিছপা হননি কিংবা হওয়ার চিন্তাও করেননি। পাকবাহিনীর হাতে গ্রেফতার বরণ ছিল বঙ্গবন্ধুর একটি রাজনৈতিক কৌশল, যা আমাদের স্বাধীনতাকে

ত্বরান্বিত করে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি জড়িয়ে পড়াকে অতীব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে প্রতিহত করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুক্তিযুদ্ধের নেতাদের ধরা পড়ার অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে। আলজেরিয়ার মুক্তিযুদ্ধের বহু নেতাকে ফরাসিবাহিনী আটক করেছিল। নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ বাহিনীর হাতে প্রায় তিন যুগ আটক ছিলেন। এতে অনুকূল বিশ্বজনমত সৃষ্টি হয় এবং শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্রতর হয়। বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর আটকের গোটা সময় এই একটি প্রশ্নই ইয়াহিয়া খানকে দেশ-বিদেশে মোকাবিলা করতে হয়েছে। যা বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছে পাকিস্তান সরকারকে। যুদ্ধরত বাংলাদেশে তখন বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষার জন্য মানুষ রোজা রেখেছে। নফল নামাজ আদায় করেছে। মুক্তিযুদ্ধ তীব্রতর হয়েছে। শত্রুমিত্র সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন, সেদিন বঙ্গবন্ধুই ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা। তাঁর নামেই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। বঙ্গবন্ধু এটা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেননি। তাছাড়া, পালাবার মতো নেতা বঙ্গবন্ধু কোনোকালেই ছিলেন না। দেশ ও জনগণের জন্য হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করার মতো মনোবল তিনি সব সময় পোষণ করতেন। মৃত্যুর সময়েও তিনি তাঁর হত্যাকারীদের তর্জনী তুলে ধমক দিয়েছেন বলে হত্যাকারীরা স্বীকার করেছে। তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাকালের খাতায় হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং শতাব্দীর মহানায়ক হিসেবে চিরদিন অমর ও অক্ষয় হয়ে থাকবেন। বঙ্গবন্ধু আমাদের গৌরব এবং অহংকার।

এছাড়া তিনি আইয়ুব-ইয়াহিয়ার আমলে ঢাকায় (রেসকোর্সে স্বাধীনতার পরবর্তী সময় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) ঘোড়দৌড় বন্ধ, সরকারি পর্যায়ে আইন পাস করে মদ আমদানি বন্ধ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরিতে সরকারিকরণ, প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, স্বাধীনতার পর ৪৪ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ, পৌনে দু'লাখ শিক্ষককে নিয়মিত রেশনের মাধ্যমে চাল, ডাল, গম, লবণ, চিনি, সরিষা ও সয়াবিন তেল, বাটার অয়েল, গায়ে মাখা ও কাপড় কাচা সাবান, সেমাই ও ব্রেড পর্যন্ত প্রদানের ব্যবস্থা করেন। ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বই বিতরণ ও গরিব ছাত্রছাত্রীদের পোশাক প্রদান, ১৫ হাজার নতুন বিদ্যালয় সরকারিকরণ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা অধ্যাদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রদান, রিকশা শ্রমিকদের জন্য সমবায় পদ্ধতিতে অটোরিকশা প্রদানের ঘোষণা দান, শ্রমিক কর্মচারীদের (আইনগত দিক বিবেচনা করে) স্বার্থে শ্রম আদালত পুনর্গঠন, অসহায় কৃষকদের স্বার্থে ১৫ বছরের খাইখেলাপি চুক্তিকে ৭ বছরে পরিণত, বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে হকার্স মার্কেট প্রতিষ্ঠা, সামরিক একাডেমি প্রতিষ্ঠাসহ বহুবিধ কাজ করেছেন। বঙ্গবন্ধু সরকারের আমলে বাংলাদেশ ইসলামিক সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) সদস্যপদ লাভ করে। তাছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩-এ আরব-ইসরাইল যুদ্ধে আরবদের পক্ষে ১ লাখ পাউন্ড চা, ২৮ সদস্যের মেডিক্যাল টিমসহ ৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ করেছেন। তিনি দেশের উন্নয়নের পাশাপাশি কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের চেষ্টাও করেছেন।

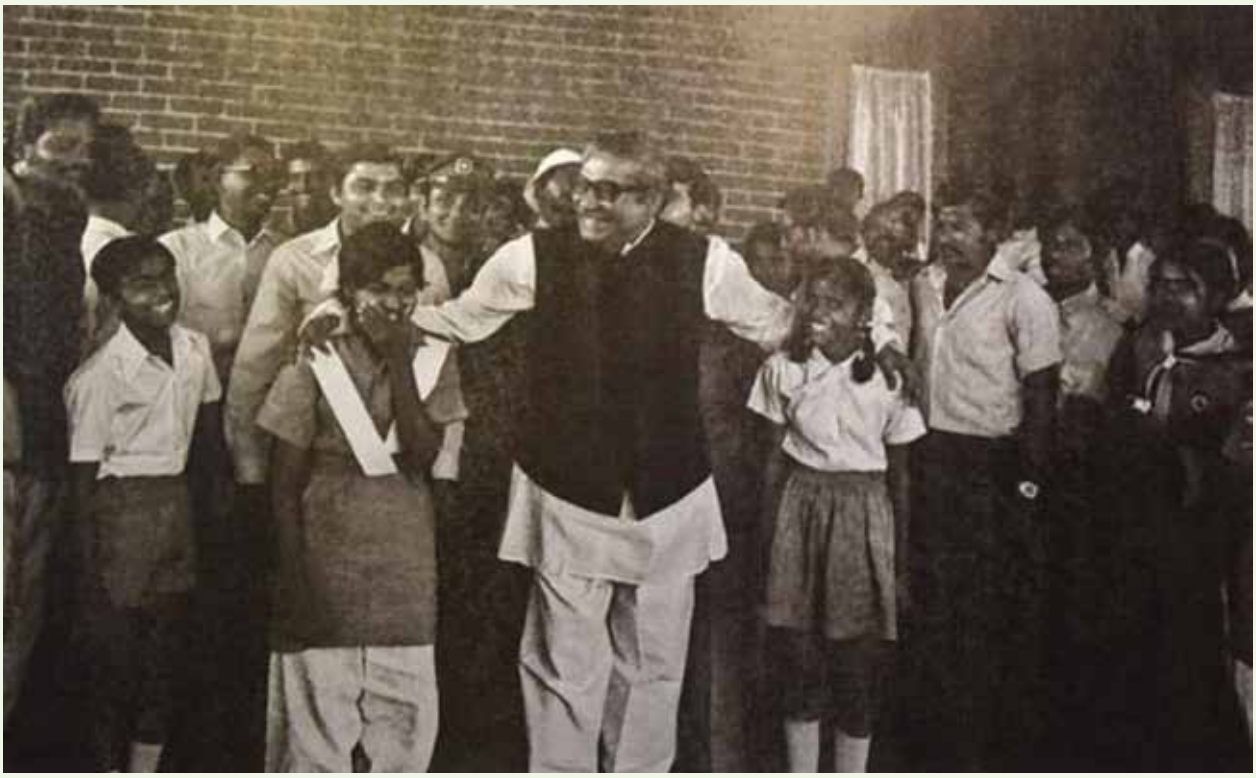

স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধু মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের জন্য মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করেছেন। তিনি বায়তুল মোকাররম মসজিদের পবিত্রতা রক্ষার্থে পূর্ব পার্শ্বস্থ স্পোর্টিং ক্লাবগুলোকে স্থানান্তর করেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা। টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমার জন্য জায়গাও বরাদ্দ করেন। তিনি কাকরাইল মসজিদের সম্প্রসারণ, মাদ্রাসার শিক্ষাকে সম্প্রসারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড গঠন করেন। বস্তুত বঙ্গবন্ধু এদেশকে একটি সুখি-সমৃদ্ধ, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলার রূপ দিতে নিজস্ব মেধা, পরিশ্রম, উদ্যোগের সর্বোত্তম প্রয়োগ করেছিলেন। এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে তাঁর চিন্তা, দূরদর্শিতা ও দেশপ্রেম কাজ করেনি।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

অসমাপ্ত আত্মজীবনী এবং দুই মানব প্রতিকৃতি

মফিদুল হক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারে পরিবার প্রদত্ত খাতার পাতায় নিজ জীবনকথা যে লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেছিলেন সেটা তাঁর কাছের মানুষেরা ছাড়া আর কারো জানা ছিল না। রুলটানা এক্সারসাইজ খাতা, যা স্কুল বালকেরা ব্যবহার করে, বন্দিদের চাহিদামাফিক তেমন খাতাই সরবরাহ করা যেত কারাগারে। জেল কর্তৃপক্ষ সিলছাপ্পর দিয়ে লিখে দিতেন খাতায় কত পাতা রয়েছে এবং কত তারিখ তা সরবরাহ করা হয়েছে। বন্দি নিজ মনের কথা কিংবা সাহিত্যিক আকুতি অথবা পঠিত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি বা স্বীয় বিচারবিশ্লেষণ যার যেমন খুশি এসব খাতায় লিখতে পারেন। তবে লেখা শেষে খাতা কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিয়ে সেন্সরের ছাড়পত্র নিয়ে তবেই আনা যেত জেলের বাইরে। তাই জেলের খাতায় জীবনকথা লিখতে হলেও অনেক সতর্কতার সঙ্গে তা করতে হতো। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* লেখা হয়েছে যে দুটি খাতায় তার একটি রাজবন্দি শেখ মুজিবুর রহমান পেয়েছিলেন ৯ই জুন ১৯৬৭ সালে, পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২৫২। এটি লেখায় ভরে যায় খুবই দ্রুত, ফলে ২২শে সেপ্টেম্বর আরো একটি খাতার বরাদ্দ তিনি পান, এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২২০। পরিবারের পক্ষ থেকেই কিনে দেওয়া হয়েছিল এই খাতা, জেলের নিয়মমাফিক বেগম মুজিব খাতা জমা দিয়ে সাক্ষাতের সময় স্বামীকে অনুরোধ করেছিলেন নিজের জীবনের কথা লিখতে। সে যাত্রায় ১৯৬৬ সালের ৮ই মে থেকে বঙ্গবন্ধু কারারুদ্ধ রয়েছেন। পূর্ব বাংলার মানুষের মুক্তিসনদ ৬-দফা ঘোষণার পর পরই আইয়ুব সরকার শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে হুংকার দিয়ে ওঠে, তাঁকে এবং তাঁর সহকর্মীদের কারারুদ্ধ করে আন্দোলন দমাতে মরিয়া হয়ে পড়ে। কারাবন্দি শেখ মুজিবের আশু মুক্তির কোনো সম্ভাবনা তখন ছিল না। বাস্তবেও তো তাই হয়েছিল, এই কারাবাস থেকে ছাড়া পাওয়া ছিল সুদূরপ্রসারী। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে তাঁকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে রাতের আঁধারে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে স্থাপিত বিশেষ বন্দিশালায়, দায়ের করা হয় পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মামলা, তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। বন্দি শেখ মুজিবও বুঝি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন খুব সহজে পাকিস্তানি কারাগার থেকে তাঁর মুক্তি মিলবে না। আর তাই বেগম মুজিবের দেওয়া খাতার তিনি সদ্ব্যবহারই করেছিলেন। টানা হাতে দ্রুততার সঙ্গে লিখে গেছেন তাঁর জীবনস্মৃতি, তিন মাসে ফুরিয়ে গিয়েছিল প্রথম খাতা, পরের খাতাও একইরকম সময়ে লিখে শেষ করেছিলেন। কেননা জানুয়ারি ১৯৬৮-এর গোড়ায় তাঁকে নেওয়া হয় ক্যান্টনমেন্টে সামরিক আদালতে বিচারের জন্য, সবরকম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত, এমনকি পরিবারের সদস্যদের সাক্ষাতেরও কোনো সুযোগ থাকে না সেখানে। তবে সৌভাগ্য আমাদের তার আগেই দুই খাতাজুড়ে বঙ্গবন্ধু লিখেছিলেন নিজের কথা।

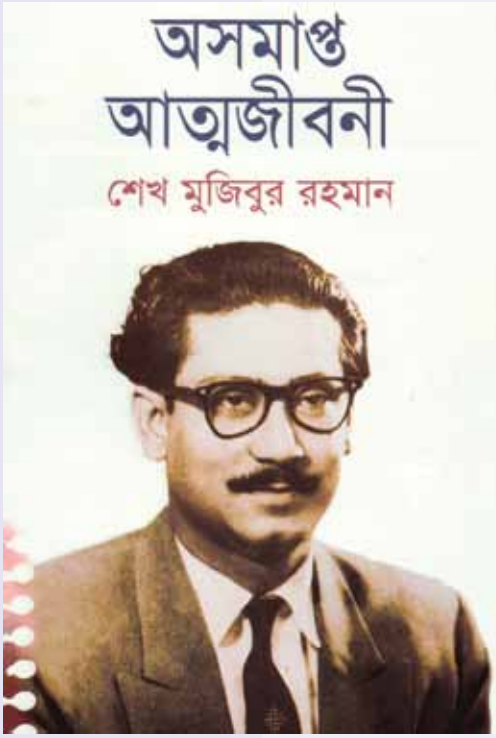

দুই খাতায় বঙ্গবন্ধু ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত জীবনকথা লিপিবদ্ধ করেছেন। অসাধারণ এই গ্রন্থের তাৎপর্য বহুমাত্রিক ও বিশাল। বর্তমান সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা সেই বিস্তারে না গিয়ে তাঁর উল্লিখিত বহু মানুষের মধ্যে কেবল দুজন সম্পর্কে কিছু কথা যুক্ত করতে চেষ্টা করব। এই দুজনের একজন গোপালগঞ্জের রামদিয়ার স্বদেশি যুগের সমাজসেবক চন্দ্র ঘোষ এবং অপর জন বিহার থেকে আগত উদ্বাস্তু উর্দুভাষী লেখক ইবনে হাসান। বঙ্গবন্ধু স্মৃতি থেকে লিখেছিলেন আত্মকথা, কোনো তথ্য যাচাই করা বা কারো সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ তাঁর ছিল না। আর তাই এমন হতেই পারে লেখকের নাম স্মরণকালে স্মৃতি তাঁকে বিভ্রান্ত করেছে, অথবা তাঁর হাতের লেখা পাঠকালে সম্পাদকরা বিভ্রান্ত হয়েছেন। আতাউর রহমান খান, মানিক মিয়া, খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস প্রমুখের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের চীন যাওয়ার সময় সাথিদের মধ্যে ছিলেন ইবনে হাসান, যাঁকে আরেক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে ইউসুফ হাসান হিসেবে। বস্তুত, দ্বিতীয় পর্যায়ে নামটি সঠিকভাবেই উল্লিখিত হয়েছে। চীন সফরে বঙ্গবন্ধুর এই সফরসঙ্গীর পুরো নাম সৈয়দ ইউসুফ হাসান। তাঁর পরিচয় *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*র সম্পাদকমণ্ডলী প্রদানে সমর্থ হননি, তাই এখানে আমরা সেটা মেলে ধরছি, যে জীবনতথ্য আমাদের প্রদান করেছেন প্রবীণ প্রগতিশীল উর্দু কবি আহমদ ইলিয়াস।

সৈয়দ ইউসুফ হাসানের জন্ম বিহারের পাটনায় এক অভিজাত জমিদার পরিবারে, ১৯২৬ সালের ২৪শে নভেম্বর। তিনি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন এবং সাজ্জাদ জহির, কাইফি আজমি প্রমুখের সূত্রে প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে যুক্ত হন। দেশ ভাগের পর ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে আসেন এবং নারায়ণগঞ্জে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে গোড়া থেকেই ছিল তাঁর দৃঢ় অবস্থান, বাহান্নর ভাষা আন্দোলনকালে তিনি ছিলেন সংগ্রাম পরিষদের সদস্য এবং ২২শে ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জ থেকে গ্রেফতার হন। পরে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে ৯২-ক ধারা জারি হলে তিনি গ্রেফতার হন এবং ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসনকালে পুনরায় কারাবন্দি হন। তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ছিলেন। ২০১৬ সালে ৯০ বছর বয়সে ঢাকায় তিনি প্রয়াত হন।

এই দুঃখ আমাদের থেকে যাবে যে, ১৯৫৪ সালে বঙ্গবন্ধুর চীন সফরের সঙ্গী এবং সহকর্মী ও সহবন্দি এই মানুষটির কাছ থেকে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে কিছু জানা আমাদের হয়ে উঠল না। ২০১২ সালে *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* যখন প্রকাশ পায় তখনও ইউসুফ হাসান জীবিত, চীন সফরের ঘটনাবলির তিনিই ছিলেন একমাত্র জীবিত সাক্ষী, আরো নানাভাবেই তিনি নিশ্চয় বঙ্গবন্ধুকে জানতেন, অথচ তাঁর কাছ থেকে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে কিছু জানা আমাদের হলো না।

আত্মজীবনীতে উল্লিখিত আরেক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব চন্দ্র ঘোষ, যাঁর সঙ্গে একান্ত আন্তরিক সম্পর্ক বঙ্গবন্ধু মেলে ধরেছেন কারাভ্যন্তরের এক অনন্য মানবিক ঘটনার মধ্য দিয়ে। তবে এই ব্যক্তির প্রকৃত নাম চন্দ্র বোস, হতে পারে পাণ্ডুলিপির হস্তাক্ষর পাঠকালে সম্পাদকদের এমন বিভ্রান্তি ঘটেছে, বোস হয়ে গেছেন ঘোষ। তাঁর সম্পর্কেও টিকা-টিপ্পনিতে কোনো পরিচিতি সংযোজিত হয়নি, পরবর্তী সংস্করণে সে পরিমার্জন আমরা প্রত্যাশা করব। চন্দ্রনাথ বসুর জন্ম গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীর রামদিয়া গ্রামে ১৮৯৩ সালের ডিসেম্বরে। এই গ্রামের নব প্রজন্মের সন্তান রাজনীতিবিদ অসিতবরণ রায় তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আমাকে জানিয়েছেন। চন্দ্রনাথ বসু এলাকায় বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সেবাশ্রম, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছেন। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সম্পর্কের যে মর্মস্পর্শী বিবরণ রয়েছে তার কিঞ্চিৎ পরিচয় এখানে মেলে ধরা হলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন :

'আমি ফরিদপুর জেলে ফিরে এলাম। এবার আমাকে রাখা হলো রাজবন্দিদের ওয়ার্ডে। এই ওয়ার্ডে দুইটা কামরা। এক কামরায় পাঁচজন ছিল। আরেক কামরায় গোপালগঞ্জের বাবু চন্দ্র ঘোষ, মাদারীপুরের বাবু ফণি মজুমদার ও আমি।...

চন্দ্র ঘোষ ছিলেন একজন সমাজকর্মী। জীবনে রাজনীতি করেন নাই। মহাত্মা গান্ধীর মতো একখানা কাপড় পরতেন, একখানা কাপড় গায়ে দিতেন। শীতের সময়ও তার কোনো ব্যতিক্রম হত না। জুতা পরতেন না, খড়ম পায়ে দিতেন। গোপালগঞ্জ মহকুমায় তিনি অনেক স্কুল করেছেন। কাশিয়ানী থানার রামদিয়া গ্রামে একটা ডিগ্রি কলেজ করেছেন। অনেক খাল কেটেছেন, রাস্তা করেছেন। এই সমস্ত কাজই তিনি করতেন।...

আমি ফরিদপুর জেলে আসলাম স্বাস্থ্য খারাপ নিয়ে। এসেই আমার ভীষণ জ্বর, আবার যন্ত্রণা, বুকে ব্যথা অনুভব করতে লাগলাম। চিকিৎসার ত্রুটি করছেন না জেল কর্তৃপক্ষ, তবুও কয়েকদিন খুব ভুগলাম। রাতভর চন্দ্র বাবু আমার মাথার কাছে বসে পানি ঢেলেছেন। যখনই আমার হুঁশ হয়েছে, দেখি চন্দ্র বাবু বসে আছেন। তিন দিনের মধ্যে আমি চন্দ্র বাবুকে বিছানায় শুতে দেখি নাই।

আমার মাথা টিপে দিয়েছেন। কখনও পানি ঢালছেন, কখনও ওষুধ খাওয়াচ্ছেন। কখনও পথ্য খেতে অনুরোধ করছেন। না খেতে চাইলে ধমক দিয়ে খাওয়াতেন। আমি অনুরোধ করতাম এত কষ্ট না করতে। তিনি বলতেন, 'জীবনভরই তো এই কাজ করে এসেছি, এখন বুড়াকালে কষ্ট হয় না'।

এরপর যে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তা পাঠককে আলোড়িত না করে পারে না। তিনি লিখেছেন এর কিছুদিন পরের ঘটনা :

'আমি ফরিদপুর জেলে ফিরে এলাম। দেখি চন্দ্র বাবু হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন, অবস্থা খুব খারাপ। তাঁর হার্নিয়ার ব্যারাম ছিল। পেটে চাপ দিয়েছিল, হঠাৎ নাড়ি উল্টে গেছে, ফলে গলা দিয়ে মল পড়তে শুরু করেছে। যে কোন সময় মারা যেতে পারেন। সিভিল সার্জন সাহেব খুব ভাল ডাক্তার। তিনি অপারেশন করতে চাইলেন, কারণ মারা যখন যাবেন তখন শেষ চেষ্টা করে দেখতে চান। আত্মীয়স্বজন কেউ নাই যে, তাঁর পক্ষ থেকে অনুমতিপত্র লিখে দিবে। চন্দ্র ঘোষ নিজেই লিখে দিতে রাজি হলেন। বললেন, 'কেউ যখন নাই তখন আর কি করা যাবে'। সিভিল সার্জন সাহেব বাইরের হাসপাতালে নিতে হুকুম দিলেন। চন্দ্র ঘোষ তাঁকে বললেন, 'আমাকে বাইরের হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন। আমার তো কেউ নাই। আমি শেখ মুজিবুর রহমানকে একবার দেখতে চাই, সে আমার ভাইয়ের মতো। জীবনে তো আর দেখা হবে না'। সিভিল সার্জন এবং জেলের সুপারিনটেনডেন্ট, তাঁদের

নির্দেশে আমাকে জেলগেটে নিয়ে যাওয়া হল। চন্দ্র ঘোষ স্ট্রেচারে শুয়ে আছেন। দেখে মনে হলো, আর বাঁচবেন না, আমাকে দেখে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, 'ভাই, এরা আমাকে 'সাম্প্রদায়িক' বলে বদনাম দিল; শুধু এই আমার দুঃখ মরার সময়! কোনোদিন হিন্দু মুসলমানকে দুই চোখে দেখি নাই। সকলকে আমায় ক্ষমা করে দিতে বোলো। আর তোমার কাছে আমার অনুরোধ রইলো, মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখো। মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য ভগবানও করেন নাই। আমার তো কেউ নাই, আপন ভেবে তোমাকে শেষ দেখা দেখে নিলাম। ভগবান তোমার মঙ্গল করুক'। এমনভাবে কথাগুলো বললেন যে, সুপারিনটেনডেন্ট, জেলার সাহেব, ডেপুটি জেলার, ডাক্তার ও গোয়েন্দা কর্মচারী সকলের চোখেই পানি এসে গিয়েছিল। আর আমার চোখেও পানি এসে গিয়েছিল। বললাম, 'চিন্তা করবেন না, আমি মানুষকে মানুষ হিসাবেই দেখি। রাজনীতিতে আমার কাছে মুসলমান, হিন্দু ও খ্রিষ্টান বলে কিছু নাই। সকলেই মানুষ'।

চন্দ্রনাথ বসু সে যাত্রা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন, তিন বছর কারাবাসের পর তিনি মুক্তি পান ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বরে। ইতোমধ্যে ১৯৫০ সালের দাঙ্গা পূর্ব বাংলায় সংখ্যালঘুদের জীবন তছনছ করে দিয়েছিল, দলে দলে তাঁরা দেশান্তরী হয়েছিলেন, চন্দ্রনাথ বসুও দেশ ছেড়ে চলে যান পশ্চিম বাংলায়। সেখানেও তিনি বিভিন্ন শিক্ষা ও জনকল্যাণমূলক কাজ করে চলেন। ১৯৫৭ সালে শেখ মুজিব কলকাতায় এলে তাঁদের উভয়ের আবার সাক্ষাৎ ঘটে। একাত্তরে শরণার্থী শিবিরে কাজ করেন চন্দ্রনাথ বসু। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর ডাকে ১৯৭২ সালের মার্চে তিনি ফিরে আসেন বাংলাদেশে। ১৯৭৪ সালের শুরুতে তিনি চিকিৎসার জন্য কলকাতা যান, আগস্টে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হলে তাঁর আর দেশে ফেরা হয় না। ২রা জুন ১৯৭৯ কলকাতায় চন্দ্রনাথ বসুর মৃত্যু ঘটে।

এখন *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* পাঠকালে মনে হয় বঙ্গবন্ধুর জীবন ঘিরে কত কাজ আমাদের অসমাপ্ত রয়ে গেছে, ঠিক সময়ে আমরা কাজগুলো করিনি, চন্দ্রনাথ বসুর কাছ থেকে জেনে নিইনি তাঁর ছোটো ভাই শেখ মুজিবের কথা।

লেখক: ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

প্রবন্ধ

বঙ্গবন্ধুঃ দুখি মানুষের স্বপ্নদ্রষ্টা

সেলিনা হোসেন

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে এসেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ঢাকা বিমানবন্দর থেকে সরাসরি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আসেন। তাঁর ফেরার প্রতীক্ষায় ছিল দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ। তিনি বক্তৃতা মঞ্চে ওঠেন। শুরু হয় ভাষণ। এক পর্যায়ে বলেন, 'আপনারা আরও জানেন যে, আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। আমার সেলের পাশে আমার জন্য কবরও খোঁড়া হয়েছিল। আমি মুসলমান। আমি জানি, মুসলমান মাত্র একবারই মরে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি

টুঙ্গিপাড়ায় সাধারণ মানুষের সাথে আলাপচারিতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

তাদের নিকট নতি স্বীকার করব না। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালী, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। জয় বাংলা। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাত্রে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে বন্দী হওয়ার পূর্বে আমার সহকর্মীরা আমাকে চলে যেতে অনুরোধ করেন। আমি তখন তাঁদের বলেছিলাম, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে বিপদের মুখে রেখে আমি যাব না। মরতে হলে আমি এখানেই মরব। বাংলা আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। তাজউদ্দীন এবং আমার অন্য সহকর্মীরা তখন কাঁদতে শুরু করেন।'

নিজের জাতিসত্তা এবং গণমানুষের আইডেনটিটির প্রশ্নে এমনই ছিল তাঁর রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনবোধ। বিশ্বের কোনো আধুনিক রাষ্ট্রই নিজের আপন পরিচয়ের বাইরে থাকতে পারে না। একমাত্র ঔপনিবেশিক শক্তির কাছে নতজানু রাষ্ট্রই নিজ আত্মপরিচয়কে শৃঙ্খলিত করে রাখতে পারে। বঙ্গবন্ধু তাঁর জাতিসত্তার পরিচয়ে ছিলেন আপোশহীন। পাকিস্তান সরকারের নাকের ডগায় তিনি উচ্চারণ করেছিলেন, 'পূর্ব পাকিস্তান না বলে আমাদের ভূখণ্ডকে 'পূর্ব বাংলা বলুন'। পূর্ব পাকিস্তান বলতে হলে বাঙালীর গণভোটের ব্যবস্থা করুন'। তিনি সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সভায় পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন, 'দেশটির নাম রাখা হবে বাংলাদেশ'।

স্বাধীনতা লাভের আগেই বঙ্গবন্ধু দেশের নাম ঠিক করেছিলেন। তিনি দেশজুড়ে প্রদান করা ভাষণে অনবরত বলেছেন গণমানুষের অধিকারের কথা। দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন মানুষ হিসেবে মর্যাদার সঙ্গে বাস করার মৌলিক সত্য।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন। তিনি তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থে লিখেছেন : 'আমার কেবিনের একটা জানালা ছিল ওয়ার্ডের দিকে। আমি ওদের রাত একটার পরে আসতে বললাম।... রাতে কেউ আসে না বলে কেউ কিছু বলত না। পুলিশরা চুপচাপ পড়ে থাকে, কারণ জানে আমি ভাগব না। গোয়েন্দা কর্মচারী একপাশে বসে ঝিমায়। বারান্দায় বসে আলাপ হল এবং আমি বললাম, সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে।... আবার ষড়যন্ত্র চলছে বাংলা ভাষার দাবিকে নস্যাৎ করার। এখন প্রতিবাদ না করলে কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলিম লীগ উর্দুর পক্ষে প্রস্তাব পাস করে নেবে। নাজিমুদ্দীন সাহেব উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথাই শুধু বলেন নাই, অনেক নতুন নতুন যুক্তিতর্কও দেখিয়েছেন।... সেখানেই ঠিক হল আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে এবং সভা করে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকেই রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কনভেনর করতে হবে। ফেব্রুয়ারি থেকেই জনমত সৃষ্টি করা শুরু হবে। আমি আরও বললাম, 'আমিও আমার মুক্তির দাবি করে ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করব।'

মাতৃভাষার মর্যাদাকে তিনি রাজনৈতিক অধিকার বলে বুঝেছিলেন। এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে ধ্বংস হয় মাতৃভাষার গৌরব। আজ বিশ্বের দরবারে ভাষার জন্য প্রাণদানকারী দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'। ইউনেস্কো ঘোষণা দিয়েছে এই দিবস পালন করার জন্য। আধুনিক রাষ্ট্র তার অর্জনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের মধ্যে দেখতে চায়। বাংলাদেশ সেই অর্জনে জয়ী হয়েছে। এই অর্জনের নেপথ্য ভূমিকায় বঙ্গবন্ধুর অবদান স্মরণীয়।

ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল তাঁর জীবন দর্শনের একটি অন্যতম দিক। ছাত্রজীবন থেকে তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। যে-কোনো আধুনিক রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় এটি একটি মৌলিক শর্ত। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধলে তিনি দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকায় রিলিফের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। বিপন্ন মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ভারতের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্ত। তিনি ১৯৪৩ সাল থেকে ইসলামিয়া কলেজে শিক্ষকতা করতেন। তাঁর *ষাট দশক* শিরোনামের বইয়ে তিনি দাঙ্গার সময়ের স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন

: 'ইসলামিয়ার ছাত্ররা যে আমাদের জন্য কতটা করতে পারত তার প্রমাণ পেলাম ১৯৪৬-এর রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়। বালিগঞ্জ থেকে ইসলামিয়া কলেজের রাস্তায় পদে পদে বিপদ। এই রাস্তা আমাদের ছাত্ররা পার করে দিত। ওরা বালিগঞ্জের কাছে অপেক্ষা করত আর সেখান থেকে ওয়েলেসলি স্ট্রিটে কলেজে নিয়ে যেত। আবার সেভাবেই ফিরিয়ে দিতে যেত। এখানে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি ইসলামিয়া কলেজের সেইসব মুসলমান ছাত্রদের, যাঁরা আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে বিপজ্জনক এলাকাটা পার করে দিতেন। এইসব ছাত্রদের একজনের নাম ছিল শেখ মুজিবুর রহমান'।

১৯৬৪ সালের বাঙালি-বিহারি দাঙ্গার সময় তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছিলেন। নারায়ণগঞ্জে ভয়াবহ সহিংসতার মধ্যে বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। দাঙ্গা-বিরোধী কমিটিতে থেকে 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' লিফলেট প্রকাশ করে বিতরণ করেছিলেন। দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন বঙ্গবন্ধু। 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' লিফলেট প্রচার করার দায়ে তাঁকে পাকিস্তান প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন অর্ডিনেন্স এবং পাকিস্তান দণ্ডবিধি প্রয়োগ করে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পরে তিনি জামিনে মুক্তিলাভ করেন।

এভাবে সাহসের সঙ্গে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। মানবতার দর্শন তাঁর মর্মমূলে ছিল। যেজন্য তাঁর দুখি মানুষের চেতনায় ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে মানুষের ধর্মই প্রধান ছিল। নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী ছিলেন বঙ্গবন্ধু। স্বাধীনতার পরে নির্যাতিত নারীদের তিনি 'বীরাঙ্গনা' খেতাবে ভূষিত করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল নারী পুনর্বাসন বোর্ড। নির্যাতিত নারীদের পরিচর্যা এবং আবাসনের জন্য গঠিত হয়েছিল এ বোর্ড। যুদ্ধ-পরবর্তী পরিস্থিতিতে এই কঠিন সমস্যা তিনি অনাবিল চিত্তে মোকাবিলা করেছিলেন। চেষ্টা করেছেন মেয়েদের সামাজিক অবস্থান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে।

অন্যদিকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করেছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভায় নারীদের মন্ত্রিত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৭৪ সালে মুসলিম বিবাহ এবং বিবাহ রেজিস্ট্রিকরণ আইন প্রণীত হয়েছিল। সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে নারী-পুরুষের সমতার কথা উল্লেখ আছে। আজকের বাংলাদেশের লক্ষ্য হলো সহিংসতা নয়, নারী-পুরুষের সমতার মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়া।

কিশোর বয়স থেকেই তিনি মানুষের কথা ভেবেছেন। তাদের জন্য কিছু করার স্বপ্ন দেখেছেন। সেই বঞ্চিত মানুষদের কথা মনে রেখেই তিনি শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করেন। চল্লিশের দশক থেকে শুরু করে সত্তর দশক পর্যন্ত রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তা ছিল একটি জাতির মুক্তির দিক নির্দেশনা। দ্বিতীয়ত, একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর যে দরদ এবং ভালোবাসা ছিল তা এক গভীর জীবনসত্য। তাঁর তুলনা শুধু তিনি নিজেই। তাঁর দুটি বক্তৃতার কথা উল্লেখ করা যায়। প্রথমটি '৭২ সালের ৫ই অক্টোবর গণপরিষদে প্রদত্ত খসড়া শাসনতন্ত্র অনুমোদন উপলক্ষে। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন শাসনতন্ত্রের ৪টি স্তম্ভ– জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। পরের বক্তৃতাটি দিয়েছেন '৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারিতে জাতীয় সংসদে। নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রশাসনকে তিনি গণমানুষের সেবক হতে বলেছিলেন। তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, সরকারি কর্মচারীদের মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে যে তারা শাসক নন, সেবক। Some people came to me and wanted protection from me. I told them, my people want protection from you, gentlemen. এমনই ছিলেন তিনি। ছেড়ে কথা বলেননি আমলাদের।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ থেকে আরেকটু উল্লেখ করছি, 'আমি খবর পেলাম ঠাকুরগাঁয়ে একটা কোল্ড স্টোরেজ করা হয়েছে। এক বছর আগে সেটা হয়ে গেছে। কিন্তু 'পাওয়ার' নাই। খবর নিয়ে জানলাম 'পাওয়ার' সেখানে যেতে এক বছর লাগবে। কারণ খাম্বা নাই। খাম্বা নাকি বিদেশ থেকে আনতে হবে। মিনিস্টার সাহেবকে আমি বললাম, খাম্বাটাম্বা আমি বুঝি না। বাঁশ তো আছে। এখানে দাঁড়াও, খাম্বা কাটো, দা লাগাও। দেড় মাস, দুই মাসের মধ্যে কাজ হয়ে যাবে। এটা লাগাও। কি করে লাগবে, সেটা আমি বুঝিটুঝি না। দিল, লেগে গেল। কিন্তু আমার কাছে যদি না আসতো, এক বছরের আগে খাম্বা পেতো না, এটা হতো না। খাম্বা আসে কোত্থেকে! পাওয়ার গেলো, আলু রাখলো। আলু রাখার জায়গা নেই। এই মেন্টালিটি কেন হয়? খাম্বা বাংলাদেশের গাছে গাছে হয়। আমি বাংলাদেশের প্রতিটি থানায় 'পাওয়ার' দিতে চাই'।

রাষ্ট্র পরিচালনার যে সমস্ত নীতি তিনি নির্ধারণ করেছিলেন তা বাস্তবায়ন করার জন্য যদি সহযোগিতা পেতেন তাহলে তিনি সত্যিকার অর্থেই তাঁর দুখি মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারতেন।

মাত্র সাড়ে তিন বছর সময়ে তিনি যে বিপুল কাজ করতে চেয়েছিলেন সেটি ছিল পর্বতসমান কাজ। তারপরও তিনি সব চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করেই এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। দেশি-বিদেশি চক্রান্তের সামনে বঙ্গবন্ধু নির্ভীক ছিলেন। নিজের জীবনের জন্য ভীত ছিলেন না। বাঙালি জাতিকে অবিশ্বাস করার মতো মানসিক দীনতাও তাঁর ছিল না। তিনি মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানোকে পাপ মনে করতেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই অমর বাণীটিকে তিনি ধ্রুব সত্য মেনেছিলেন। সেজন্য নিরাপত্তার স্বার্থে নিজ বাসভবন ছেড়ে সরকারি বাসভবনে প্রহরীবেষ্টিত হয়ে থাকার কথা ভাবেননি। তাহলে তো গণমানুষের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়। দুখি মানুষকে ভালোবাসার মূল্য দিয়েছেন নিজের জীবন দিয়ে।

আধুনিক রাষ্ট্রের মৌল চিন্তায় বঙ্গবন্ধু ছিলেন দূরদর্শী এবং আধুনিক মনের অধিকারী। তিনি কখনো পশ্চাৎপদ মনোভাব নিয়ে দেশ ও জাতির ব্যাখ্যা করেননি। তাঁর সামনের সবটুকু ছিল প্রসারিত। তাঁর একটি অসাধারণ উক্তিও 'একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়ে আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে'।

বঙ্গবন্ধুর ডায়রিতে একটি গান ছিল। তাঁর প্রিয় গান হিসেবে তিনি সেটি লিখে রেখেছিলেন:

Love isn't love till you give it away
Love isn't love till it's free
The love in your heart
Wasn't put there to stay
Oh love isn't love till you give it away
You might think love is a treasure to keep
Feeling to cherish and hold
But love is a treasure for people to share
You keep it by letting it go.

এটাই ছিল তাঁর জীবনদর্শনের অন্যতম দিক love is a treasure for people to share এই অসাধারণ গানের বাণী তিনি নিজের দর্শনে অনুরণিত করেছেন।

লেখক: কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়

খালেক বিন জয়েনউদদীন

বাংলার আকাশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক সিংহপুরুষের প্রতিচ্ছবি। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা ও অসামান্য সংগ্রামের ফসল স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাংলাদেশের অপর নাম শেখ মুজিব–এই কথাটি বললেও অত্যুক্তি হবে না। বঙ্গবন্ধুকে আমরা নানাভাবে নানা উপাধিতে ভূষিত করে থাকি। নামের শুরুতেই বঙ্গবন্ধু, আবার প্রসঙ্গ-অনুসঙ্গে কখনো-বা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি কিংবা বাঙালির নয়নমণি। তাঁকে প্রখ্যাত পণ্ডিত ড. মুহম্মদ এনামুল হক বলেছেন, দুই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। বিবিসির শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দ্যুতিময় প্রথম নাম।

বঙ্গবন্ধু শাহাদত বরণ করেছেন ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট। গতায়ুর সময় এখনো অর্ধ শতাব্দী হয়নি। পঁচাত্তর থেকে একাশি ছিল দুঃসময়। এ সময় বঙ্গবন্ধুর খুনি, মদদদাতা এবং সুবিধাভোগীরা এই মানুষটিকে নিষিদ্ধ করে রেখেছিল। নিষিদ্ধকাল অতিবাহিত হলে শেখ মুজিব আপন আলোয় উদ্ভাসিত হন। মুজিব চর্চা শুরু হয় এই ভূখণ্ডে। নানা গ্রন্থে নানাভাবে তাঁকে উপস্থাপন করা হয়। হাজার হাজার গ্রন্থ রচনা করা হয়। ভাবলে অবাক হতে হয়–বঙ্গবন্ধুর মতো পৃথিবীর আর কোনো রাষ্ট্রনায়ককে নিয়ে এত বিপুলসংখ্যক গ্রন্থরাজি রচিত হয়নি। আর তাঁর ভাষণ জাতিসংঘের ইউনেস্কোর নথিভুক্ত হবার কথা কে না জানে। এভাবেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ ও বাঙালির অভিন্ন জাতিসত্তা। একারণেই তাঁকে আমরা 'জাতির পিতা' সম্বোধন করে গর্ব অনুভব করি।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ও আদর্শ জানার জন্য তাঁর কর্মদক্ষতার বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হয়। কৈশোরে প্রতিবাদী ও এক উপকারী বালক। শেখ পরিবারের ঐতিহ্য তাঁর কৈশোরকালকে আলোড়িত করেছিল। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং একজন যুবনেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। এই পর্বের শুরুটা কলকাতায়। এ সময়ে হলওয়েল স্তম্ভ অপসারণ আন্দোলনে অংশ নেন এবং বাপদাদাদের পাকি স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে দক্ষতার পরিচয় দেন। সেই ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার মোহ ভঙ্গ হয় অচিরেই, যখন রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বাঙালি জবানকে কেড়ে নেবার চক্রান্ত করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবির পক্ষ সমর্থন করে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশ নেন। তখন ঢাবি'র ছাত্র। তাঁর ছাত্রত্ব কেড়ে নেওয়া হয়। বহিষ্কার করা হয় ঢাবি থেকে। তিনি আইন শাস্ত্রে পড়াশোনা করছিলেন।

এরপর মহান ভাষা আন্দোলনের সূচনাপর্বের প্রধান নেতা। প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের তমদ্দুন মজলিশ এবং বঙ্গবন্ধুর গড়া ছাত্রলীগের কর্মী ও তাঁর সহকর্মী শওকত আলী, শামসুল হক, এম এ ওয়াদুদ, খালেক নেওয়াজ খান, কাজী গোলাম মাহবুব ও বখতিয়ার সহ অনেকে আহত হন ও বন্দি হন আন্দোলন ও প্রতিবাদে। বাহান্ন'র আন্দোলনে জেলখানায় থেকেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এভাবেই তাঁর রাজনীতির উন্মেষ পর্ব সূচিত হয়।

তখন পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের শাসকরা পূর্ব বাংলার মানুষকে শোষণ করা শুরু করেছে। অর্থনৈতিক এবং শাসনক্ষমতায় বাঙালির কোনো স্থান নেই। স্বাধিকারের প্রশ্নে সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, শামসুল হক ও শেখ মুজিব 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি দল প্রতিষ্ঠা করেন এবং এ দলের পক্ষ থেকেই পাকি শোষণ-নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরলেন বাঙালি জনমানসে। পাকি কর্তৃপক্ষও তাঁর ও তাঁদের সহকর্মীদের ওপর খড়গহস্ত। হামলা, মামলা, জেল-জুলুম শুরু হয়। শুরু হলো স্বাধিকার আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কর্মসূচি। আর এরই প্রেক্ষাপটে ১৯৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬২'র আইউব বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৪'র দাঙ্গার পর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা, ১৯৬৬'র ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচন ও ১৯৭১-এর শুরুতে অসহযোগ আন্দোলনের একচ্ছত্র নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগ ও বাংলার শোষিত, নির্যাতিত স্বাধীনতাকামী সাধারণ মানুষ। ১৯৬৮-তে তাঁর বিরুদ্ধে পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্রমূলক মামলা ছিল তাঁকে এবং আসামীদের নিঃশেষ করার অপকৌশল। বঙ্গবন্ধু সারাজীবনই ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী। এ কারণেই তিনি পাকি জেনারেল ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনায় বসেন। ১৯৭১ সালের সেই প্রেক্ষাপট ভিন্নতর। আলোচনা সফল না হওয়ায় তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ঘোষণার পরই তাঁকে বন্দি করা হয়। পঁচিশে মার্চ রাত থেকেই পাকি সৈন্যরা পূর্ব বাংলার ঢাকাসহ সর্বত্র বাঙালি নিধনে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। বঙ্গবন্ধু আগেই বুঝতে পেরেছিলেন ইয়াহিয়ার আলোচনা ও ক্ষমতা হস্তান্তরের টালবাহানা লোক দেখানো। ছাপ্পান্ন'র মতো তারা কোনোভাবেই বাঙালির হাতে ক্ষমতা অর্পণ করবে না। তাই তিনি একাত্তরের ৭ই মার্চ বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে ঐতিহাসিক দিক নির্দেশনামূলক ভাষণ দেন। পঁচিশে মার্চ বন্দি হবার পূর্বে ৭ই মার্চের ভাষণের আলোকে সকল কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবার জন্য দলীয় সহকর্মীদের নির্দেশ দেন। পঁচিশে মার্চ ইয়াহিয়ার সৈন্যদের বাঙালি নিধন শুরু হলে প্রথমে এর প্রতিরোধ শুরু করে স্বাধীনতাকামী বাঙালি জনগণ। কিন্তু নিরস্ত্র বাঙালি কতক্ষণ টিকতে পারে। অগত্যা সশস্ত্র প্রতিরোধের লক্ষ্যে সত্তুরে বিজিত সংসদ সদস্যদের নিয়ে সীমান্তবর্তী রাজ্যের আগরতলায় গিয়ে ১০ই এপ্রিল সরকার গঠন করেন। এই সরকারই মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় প্রকাশ্যে আনুষ্ঠানিক শপথ নেন। এই সরকার 'মুজিবনগর সরকার' নামে পরিচিত। শপথ অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করা হয় এবং পাকিস্তানি সৈন্যদের বাংলাদেশ থেকে চিরতরে নির্মূল করার অঙ্গীকার করা হয়। পৃথিবীর

সিংহভাগ দেশের সাংবাদিকরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সেই দিনটা ছিল ১৭ই এপ্রিল। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি। তাঁর অবর্তমানে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করা হয়। যুদ্ধের সশস্ত্রবাহিনীর নামকরণ করা হয় মুক্তিবাহিনী এবং এর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন কর্নেল এমএজি ওসমানী।

মুজিবনগর সরকার কলকাতায় বসে মুক্তিযুদ্ধ ও সরকার পরিচালনার সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ ও মুজিবনগর সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের খবর প্রচারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন চট্টগ্রামের বেলাল মোহাম্মদ নামের এক বেতারকর্মী ও তার বন্ধুদের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কর্মকর্তারা। মূলত কলকাতা থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ৫০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন প্রচার কেন্দ্রটি ভারত সরকারের সহায়তায় অজানা স্থান থেকে প্রচারিত হতো। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কর্মীরা শুধু অনুষ্ঠান বাণীবদ্ধ করে দিতেন এবং তা যথাসময়ে অকুস্থল প্রচারিত হতো। এভাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সূচনাপর্ব সূচিত হয়। যা সশস্ত্র যুদ্ধে রূপ নেয়।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ভারত, ভারতের জনগণ ও ভারতীয় সৈন্যের অবদান অপরিসীম। শরণার্থীদের আশ্রয়, মুজিবনগর সরকারকে ভারতের মাটিতে অবস্থান, মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ, অস্ত্র ও গোলাবারুদ প্রদান আমাদের যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে। বিশেষ করে পাকি কারাগারে বঙ্গবন্ধুকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে ফাঁসির দণ্ড কার্যকর করা থেকে বিরত করার লক্ষ্যে গোটা বিশ্বে পরিভ্রমণ ও চাপ সৃষ্টির সেই ঐতিহাসিক ভূমিকা আজও বাঙালিরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। নয় মাসের সেই যুদ্ধে পাকি সৈন্যরা পরাস্ত হয় আত্মসমর্পণের মাধ্যমে। একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর প্রকাশ্যে ঢাল-সড়কি ফেলে নিয়াজী দলিলে স্বাক্ষর করেন। বাংলাদেশের পক্ষে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত ইস্টার্ন কমান্ডের জেনারেল অরোরা স্বাক্ষর করেন। সেদিনই বাংলাদেশ বিশ্বে শত্রুমুক্ত ও স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বা অভ্যুদয় ঘটে। এই আত্মপ্রকাশ বা অভ্যুদয় পরিপূর্ণতা পায় বাহাত্তরের ১০ই জানুয়ারি, যেদিন পাকি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন ও দিল্লি হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু স্বদেশে ফিরেই যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। তিনি মাত্র সাড়ে তিন বছর শাসনক্ষমতায় ছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য দেশি-বিদেশি স্বাধীনতাবিরোধী একটি চক্রের গভীর ষড়যন্ত্রে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তাঁকে এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়দের নির্মমভাবে প্রাণ হারাতে হয়। এই ষড়যন্ত্রের হোতা ছিল ফারুক-রশিদ-মোশতাক গং। তাদের উপদেশ ও পরামর্শদাতাদের মধ্যে সেনাবাহিনীর পদস্থ এক কর্মকর্তার নাম চিহ্নিত হয়ে আছে। বঙ্গবন্ধুর খুনিদের কারো কারো বিচারে ফাঁসি হয়েছে। কিন্তু আমরা কি ফিরে পাবো বাংলাদেশের পিতাকে? আমরা কি ফিরে পাবো শিশু রাসেল, কিশোরী বেবী, শিশু সুকান্ত ও রিন্টুদের? আগস্ট এলে আমাদের বুক বেদনায় ফেটে যায়। আকাশের দিকে তাকালেই সেই সিংহপুরুষের প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে। ভেসে ওঠে বঙ্গজননী বেগম ফজিলাতুন নেছার মায়াবী মুখ।

কী দোষ করেছিল কামাল, জামাল, খুকি, রোজী, শেখ নাসের, আবদুর রব সেরনিয়াবাত। মণি ভাই, মণি ভাবি, কর্নেল জামিল, শহিদ, একজন পুলিশ কমিশনার, তিনজন অতিথি, চারজন বাসার কাজের লোক এবং খুনিদের বোমায় মোহাম্মদপুরে নিহত চারজন। ১৫ই আগস্টের ধারাবাহিকতায় ৩রা নভেম্বর জেলখানায় বঙ্গবন্ধুর খুনিরা জাতীয় চার নেতা ও স্বাধীনতার জাতীয় বীর তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপটেন এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামানকেও নৃশংসভাবে হত্যা করে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ এখন স্বনির্ভর। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা এখন উন্নয়নের সোপানে। তার অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় আমরা ঐক্যবদ্ধ। অপশক্তিকে আমরা পদদলিত করবই ইনশাল্লাহ। আগস্টের শোক হোক আমাদের শক্তি।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

কীর্তিমানের মৃত্যু নেই

বীরেন মুখার্জী

দুটি রক্তক্ষয়ী বিশ্বযুদ্ধসহ ছোটো-বড়ো অনেক যুদ্ধের ক্ষত লেগে আছে বিশ্বের বুকে। সভ্যতার উষালগ্ন থেকে মানুষ তার নিজস্ব দর্শন, সমবায়ী চিন্তা ও কৌশল প্রয়োগ করে বিশ্বভুবন নিজেদের করায়ত্ত করেছে। ঘোর অন্ধকারের বিপরীতে আলোক-ঐশ্বর্য তুলে এনেছে। বন্দিদশা থেকে উৎসারিত জাগরণের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে পরাধীনতার জিঞ্জির ভেঙেছে। আত্মসংযমী হয়ে, মাথা উঁচু করে নিজেদের অস্তিত্বের জানান দিয়েছে। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। পৃথিবীতে বসবাসরত নানা জাতিগোষ্ঠীর যুদ্ধ জয়ের ইতিহাস দীর্ঘ হলেও আমাদের প্রিয় জন্মভূমি সোনার বাংলাদেশ মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

বুদ্ধিদীপ্ত বাঙালির এ এক পরম পাওয়া। এরজন্য প্রধান নিয়ামক হিসেবে আপামর বাঙালি জাতির ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ-সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মহিমা উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বাঙালি জাতি স্বাধীনতার জন্য শত শত বছর সংগ্রাম করলেও শেষ পর্যন্ত অপ্রতিরোধ্য বাঙালির আত্মদান যে বৃথা যায়নি তার প্রমাণ আজকের এই স্বাধীন বাংলাদেশ, লাল-সবুজের গৌরবদীপ্ত পতাকা। বিজয়ের কৃতিত্বের দাবিদার আপামর বাঙালি হলেও যার সঠিক পরিকল্পনা ও নেতৃত্বে আমরা স্বাধীন পরিচয়ে মাথা তোলার সুযোগ পেয়েছি তিনি হচ্ছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল এবং অন্যায়, অশুভর প্রতি আপোশহীন এই মানুষটির জন্ম না হলে বাঙালি জাতির ইতিহাস যে অন্যভাবে লেখা হতো সেটা বলা বাহুল্য। '৭১- এর ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে তাঁর শাণিত তর্জনী জাগ্রত ও বজ্রকণ্ঠ ধ্বনিত না হলে বাঙালিকে আজও হয়ত পরাধীনতার নাগপাশে বন্দিদশায় কাটাতে হতো। বাঙালির ভাগ্য এতটাই সুপ্রসন্ন যে তাঁর মতো একজন বীর বাঙালির জন্ম হয়েছে এদেশের মাটিতে। তাই এই মহামানবের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়ে আছে গোটা বাঙালি জাতির শির। বাংলার সব আলো-বাতাস, ফুল-পাখি, নদী-গিরি-পর্বত, ঝরনাধারা, সবুজ প্রকৃতি, ফসলের মাঠ তাঁরই বন্দনায় উৎসবমুখর।

বাঙালি জাতির চিরদিনের আপনজন বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনৈতিক দর্শন যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনি বিশাল। বাংলার সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তিনি যে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পেয়েছেন তা অতুলনীয়। তাই তিনি মানুষের বিচারের মানদণ্ডে সহস্র বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। এছাড়া রাজনৈতিক নেতা ও আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি যতটা আলোচিত হয়েছেন বা হচ্ছেন তা উপমহাদেশের অনেক অনেক দেশবরেণ্য নেতাদের ভাগ্যেও জোটেনি। কিন্তু এই কৃতিত্ব অর্জন করতে গিয়ে তাঁকে কতিপয় বিশ্বাসঘাতকের তপ্ত বুলেটের সামনে পেতে দিতে হয়েছে বিশাল বুকের মানচিত্র। হায় দেশ! বড়ো দুর্ভাগা দেশ!

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, একটি অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা বাঙালি জাতি দীর্ঘদিন ধরে লালন করে আসছিল। পাশাপাশি জাতি একটি সঠিক ও যোগ্য নেতৃত্বের আশা করেছিল দীর্ঘদিন। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির মুক্তির লক্ষ্যে ৬ দফা ঘোষণা করে প্রথমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ৬ দফা মূলত স্বতন্ত্র ভৌগোলিক শাসনব্যবস্থায় দুই মুদ্রাব্যবস্থা অর্থাৎ দুটি দেশের ভিন্নধর্মী অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিপরীতে বাঙালির অস্তিত্ব নির্দেশক, নির্যাতিত মানুষের মুক্তিসনদ হিসেবে আখ্যায়িত। অপরদিকে বঙ্গবন্ধু ৬ দফা দাবি উপস্থাপন করায় পাকিস্তানি শাসকরাও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা গর্জে ওঠা বাঙালির স্বতঃপ্রণোদিত আন্দোলন ঠেকাতে প্রতিহিংসার পথ বেছে নেয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী জেনে গিয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমানকে দমন করতে না পারলে পূর্ব-পাকিস্তান হাতছাড়া হতে দেরি হবে না। সংগত কারণেই মুজিবের জীবনে নেমে আসে জেল-জুলুম-নির্যাতন। কিন্তু তাঁর বজ্রকণ্ঠ তখনো অমলিন, হাসি চিরস্থায়ী। স্বভাবসুলভ মানসিকতায় তিনি হাসিমুখে মেনে নিতে পেরেছেন নিজের ওপর সব ধরনের নির্যাতন। তিনি সর্বান্তকরণে চেয়েছিলেন, বাঙলি যেন মাথা উঁচু করে বিশ্ববাসীর সামনে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু নিয়তির পরিহাস যে, শেষ পর্যন্ত এই মহান নেতা জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন– তিনিই সত্যিকারের বাঙালি। পূর্ববঙ্গবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় স্বাধিকার আন্দোলনের পথ ধরে ৬ দফার দাবিকে তিনি বলেছিলেন, আমাদের বাঁচার দাবি। এর চৌম্বক কথাগুলো হলো, পাকিস্তানে ফেডারেল ধাঁচের রাষ্ট্র কাঠামোর ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সরকার হবে সংসদীয়, নির্বাচন পদ্ধতি সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটার ভিত্তিক; ফেডারেল সরকার কেবল দেখাশুনা করবে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়; বাংলাদেশ অঞ্চলে বাঙালিদের নিয়ে গঠিত একটি শক্তিশালী মিলিশিয়া থাকবে যার দায়িত্ব হবে পূর্ব বাংলার প্রতিরক্ষা। বঙ্গবন্ধুর এই দাবি বাঙালিদের কাছে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠলে আইয়ুব সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু এই কর্মসূচিকে জনপ্রিয় করতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে জনসংযোগ-সভা-সমিতি করেন। পাকিস্তানের শঙ্কিত প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেন। কিন্তু কিছুতেই বাঙালির স্বাধীনতা রুখে দিতে পারেনি সে গর্জন। বলার অপেক্ষা রাখে না, এটা সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধুর বুদ্ধিদীপ্ত রাজনৈতিক দর্শনের কারণেই।

তৎকালীন কিউবার প্রধানমন্ত্রী ফিদেল ক্যাস্ত্রোর সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধু আপোশহীন ছিলেন বলে তাঁর নানা শ্রেণির শত্রু থাকাটা স্বাভাবিক। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ছিল তাঁর প্রধান শত্রু। যে কারণে আইয়ুব শাহীর সামরিকতন্ত্র শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের মামলা দায়ের করে। এটি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত। এই মামলায় পাক সরকার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনে তাহলো– 'গোপনসূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের অনুসরণে এমন একটি ষড়যন্ত্র উদঘাটন করা হয় যার মাধ্যমে ভারত কর্তৃক প্রদত্ত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও অর্থ ব্যবহার করে পাকিস্তানের একাংশে সামরিক বিদ্রোহের দ্বারা ভারতের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত একটি স্বাধীন সরকার গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত থাকার দায়ে ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কতিপয় ব্যক্তিকে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা আইনের আওতায় এবং কতিপয় ব্যক্তিকে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে চাকরির সাথে সম্পৃক্ত আইনের আওতায় গ্রেফতার করা হয়'। এ মামলায় অভিযুক্ত ও এক নম্বর আসামি করা হয় বঙ্গবন্ধুকে। বাঙালির আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত ও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক স্বাধীনতার নাম যদি ষড়যন্ত্র হিসেবে তুল্য হয় তাহলে বঙ্গবন্ধু কেন তাতে পিছপা হবেন, কেন দমে যাবে তার মনোবল! বঙ্গবন্ধু এমনই এক বাঙালি সত্তা, যে সত্তা কখনো কোনো ষড়যন্ত্রের কাছে মাথা নত করতে শেখেনি।

এখানে একটা কথা আলোচনায় নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন যে, কিউবার প্রয়াত নেতা বিপ্লবী ফিদেল ক্যাস্ত্রো ১৯৭৩ সালে আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের (ন্যাম) চতুর্থ সম্মেলনে প্রথম দেখায় বঙ্গবন্ধুকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'আই হ্যাভ নট সিন দ্য হিমালয়েজ, বাট আই হ্যাভ সিন শেখ মুজিব। ইন পারসোনালিটি অ্যান্ড ইন কারেজ, দিস ম্যান ইজ দ্য হিমালয়েজ। আই হ্যাভ দাজ হ্যাড দ্য এক্সপেরিয়েন্স অব উইটনেসিং দ্য হিমালয়েজ'। অর্থাৎ 'আমি হিমালয় পর্বতমালা দেখিনি; কিন্তু আমি শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসিকতায় এই মানুষই হিমালয়। এভাবে আমার হিমালয়ও দেখা হয়ে গেল'। বিশ্বের জননন্দিত এই বিপ্লবী নেতা বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে যে উক্তি করেছিলেন, তা বঙ্গবন্ধুকে চিনে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট। ফিদেল ক্যাস্ত্রোর মতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চলার পথও কোনো অবস্থাতেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। সেজন্য তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রনেতাদেরও রক্তচক্ষু। বিপ্লব নিয়ে যেমন ফিদেলেরও অনেক বিখ্যাত ও জনপ্রিয় উক্তি রয়েছে। তেমনিভাবে বঙ্গবন্ধুর– 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ', 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', 'ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়েও বলব, আমি বাঙালি', 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, আমি চাই বাংলার মানুষের মুক্তি' উক্তিগুলো বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসের সম্পদ বলেও বিবেচিত।

সত্য যে, যুদ্ধ মানেই বিপন্ন মানবতা। অজস্র লাশ আর শোকের কফিন। যুদ্ধ মানে রক্তপাত আর শোষিত-নিপীড়িত মানুষের মুক্তির হাহাকার। বিপরীতে শান্তি ও স্বস্তির সাদা কবুতর। বঙ্গবন্ধুই এই শান্তির পতাকা শক্ত হাতে তুলে এনেছিলেন। বজ্রকণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা বুঝতে পেরেছিল, বাঙালিকে দমিয়ে রাখা সহজসাধ্য কাজ নয়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলার জনগণের স্বাধিকার আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন হয়েছে; যার চূড়ান্ত পরিণতি বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ। বাঙালির নিজস্ব একটি ভূখণ্ড, একটি সার্বজনীন পতাকা। একটি নতুন রাষ্ট্র, যার নাম 'বাংলাদেশ'। বঙ্গবন্ধু স্বশরীরে উপস্থিত নেই এটা যেমন সত্য, তেমনিভাবে কীর্তিমানের মৃত্যু নেই এটাও শাশ্বত। বাঙালি একটি স্বাধীন জাতি, যে জাতির পিতার নাম 'বঙ্গবন্ধু'। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ; যে নাম বাঙালির একটি স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস; অমলিন ও চিরকালীন।

লেখক: কবি, গবেষক, প্রাবন্ধিক ও গণমাধ্যমকর্মী

বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক পরিয়ে দিচ্ছেন বিশ্বশান্তি পরিষদের মহাসচিব মি. রমেশ চন্দ, ২৩শে মে ১৯৭৩

স্বপ্নদ্রষ্টা শেখ মুজিব

বরুণ দাস

আজ পনেরো আগস্ট আজ বাঙালির শোক
অনার্য পতাকা হয়ে বাংলার আকাশটাও আজ নত হোক।

'বঙ্গবন্ধু' আর 'বাংলাদেশ'– সকল বাঙালির অন্তরে শব্দ দুটি যেন অনেকটা সমার্থক। আমাদের প্রিয় এই মাতৃভূমি বাংলাদেশের কথা যখন বলা হয়, মনের আয়নায় তখন জেগে ওঠে বাংলাদেশের সবুজ পতাকা। আর তার মাঝের লাল সূর্যের ভেতর থেকে যেন জেগে ওঠে জ্যোতির্ময় এক পুরুষের মুখচ্ছবি। যিনি বাঙালির স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার স্থির লক্ষ্যে অবিচল থেকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছেন, কোথাও মাথা নত করেননি, আপোশ করেননি। তিনি আর কেউ নন, বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের মহানায়ক, আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন ইতিহাসের সেইসব বিরল সৌভাগ্যবানদের অন্যতম যাঁরা চরম নির্যাতনের মধ্য দিয়েও লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রামে এগিয়ে গেছেন, স্পর্শ করেছেন জনপ্রিয়তার শীর্ষ, অর্জন করেছেন চূড়ান্ত বিজয়।

সমগ্র বাঙালি জাতিকে আপন আবাসভূমির স্বপ্ন দেখিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো' তাঁর সময়ে এটি কেবল আন্দোলনের স্লোগানই ছিল না, ছিল মানুষের প্রাণের আকুতি। তাই বঙ্গবন্ধুই বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের মহানায়ক, আমাদের জাতির পিতা।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন শান্তিবাদী, মানবতাবাদী। বিশ্ব শান্তি পরিষদ তাঁকে 'জুলিও কুরি' শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করে। তিনি পৃথিবীর সকল সংগ্রামী নির্যাতিত জনগণের সঙ্গে বার বার একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে মাত্র দুজন জীবিত নেতার নামে তোরণ হয়েছিল– একজন মার্শাল টিটো এবং অন্যজন বাংলার নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। সেখানে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'বিশ্ব আজ দুভাগে বিভক্ত– শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে'। জাতিসংঘে তিনি অ্যারাবিক, স্প্যানিশ, ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান– এই পাঁচ ভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার রেওয়াজ উপেক্ষা করে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেন। বক্তৃতা শেষে বিপুল করতালি হলো। তানজানিয়ার প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস নায়ার বললেন, 'তুমি শুধু বাঙালি জাতিরই নেতা নও। এমন দিন আসবে যেদিন তুমি তৃতীয় বিশ্বে সমগ্র নির্যাতিত, বঞ্চিত মানুষের নেতৃত্ব দেবে'। সেদিনের সেই মন্তব্য পরবর্তীকালে যে অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল সেকথা বলাই বাহুল্য।

বাহান্নর রক্তাক্ত শরীর নিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের লড়াইয়ের যে ধারা সূচিত হয়, সে লড়াই ধাপে ধাপে বিকশিত হয়ে বাঙালি জাতির মুক্তির লড়াইয়ে রূপ লাভ করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে। এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই বাংলার কৃষক, মেহনতি জনতা সার্বিক মুক্তির পথটি খুঁজে পেতে চেয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের বুকে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান এই সুদীর্ঘ সংগ্রামের চাহিদা ও জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে শুধু উপলব্ধিই করেননি, এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথও তিনি রচনা করেন। তিনি জনগণের মূল আকাঙ্ক্ষাটি সঠিকভাবে চিনতে কখনোই ভুল করেননি। কারণ তিনি ছিলেন স্বপ্নদ্রষ্টা।

১৯৪৮ সালে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে যখন আন্দোলন শুরু হয়, শেখ মুজিবুর রহমান তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি জেলে অন্তরিন থাকলেও আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ১৯৫৩ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। বাঙালির একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের জন্য নিরন্তর পরিশ্রম করে গেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৫৫ সালে তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণ, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো, সর্বোপরি রাজনৈতিক পরিভাষায় শোষণহীন সমাজ গড়ে তোলার প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করেছিলেন এবং সেসব দূর করার লক্ষ্যে বৈপ্লবিক পদক্ষেপও নিয়েছিলেন। ঘুণে ধরা প্রশাসনের পরিবর্তে এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতাপূর্ণ দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনিক কাঠামোর বিপরীতে সর্বস্তরের জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার প্রত্যয়ে সর্বস্তরে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠনের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান মুখপাত্রের স্বীকৃতি লাভ করেন। তাঁর ঘোষিত ৬ দফা দাবির পক্ষে জনগণ নিরঙ্কুশ রায় দেয়। শেখ মুজিবকে সরকার গঠনের সুযোগ না দিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন একতরফা বাতিল করে দিলে পুরো প্রদেশ বিক্ষোভে ফুঁসে ওঠে। ১৯৭১-এর ২রা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকা অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে সকল স্তরের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব তাঁর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। কারণ কবির ভাষায়–

মুজিবুর রহমান
ওই নাম যেন ভিসুভিয়াসের অগ্নি-উগারি বান।

বাঙালি হওয়া যে গৌরবের বিষয়, এই বোধ বঙ্গবন্ধুই জাগিয়েছেন আমাদের মধ্যে। তিনি তাঁর সংগ্রাম আর ত্যাগের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাঙালিদের স্বার্থের পরিপন্থি কোনো কাজ তিনি কখনো করেননি, ভাবেননি কিংবা ভাবনায়ও আনেননি। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হতো না, যদি না আমরা পেতাম শেখ মুজিবুর রহমানের মতো মহান, প্রতিভাবান এবং ত্যাগী নেতা। আমাদের মুক্তি সংগ্রামের সিংহভাগ সময় জুড়ে আছেন তিনি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালি জাতিসত্তার বিষয়ে আমাদের গর্ববোধ করতে শিখিয়েছেন। তিনি আমাদের একটি মানচিত্র, একটি দেশ উপহার দিয়েছেন। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির মডেল তুলে ধরেছেন যা থেকে অনেক দেশই শিক্ষা নিতে পারত। বঙ্গবন্ধু শুধু রাজনৈতিক দলের নেতা নন, তিনি একইসাথে একজন দেশনায়কও বটে। সংকটের চরম মুহূর্তে তিনি স্থির ও অবিচল থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন। তাইতো তিনি জাতীয় নেতা থেকে জাতির পিতা হতে পেরেছেন।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন শিশুর মতো সরল, সাহসে অনমনীয়, প্রয়োজনে বজ্রের মতো কঠোর। সেইসঙ্গে মিশেছে দুর্জয় মনোবল আর নিজের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা। পিছিয়ে থাকা কৃষিনির্ভর সমাজ এবং তার সাথে যুক্ত মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা ছিল বাংলাদেশের যে-কোনো ধরনের প্রগতিশীল চিন্তাধারা বিকাশের পথে প্রবল অন্তরায়। সেই পাহাড়সম বাঁধা পেরিয়ে তিনি ছিলেন আলোর দিশারির ভূমিকায়। বঙ্গবন্ধু ছিলেন চরিত্রে জাতীয়তাবাদী, স্বভাবে গণতন্ত্রী, বিশ্বাসে সমাজতন্ত্রী এবং আদর্শে ধর্মনিরপেক্ষ। তাই বাঙালি জাতীয়তাবাদের তিনি উদ্যোক্তা, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা, সমাজতন্ত্রী অর্থনীতির প্রবক্তা এবং একইসাথে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র আদর্শের অনুসারী।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রায় সাড়ে তিন বছর বাংলাদেশ সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সরকারকে অত্যন্ত প্রতিকূল এবং বিধ্বস্ত অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয়। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট তারিখে সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাসী সদস্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের নির্মমভাবে হত্যা করে। এক মহানায়কের আদর্শের মূলে এই আঘাত শুধু বাঙালি জাতি নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীকে করেছে হতবাক। কিন্তু তাঁর এই মৃত্যু সত্যিকারের মৃত্যু নয়। বঙ্গবন্ধু নিহত হয়েও বেঁচে থাকবেন মানুষের স্মৃতিতে এবং হৃদয়ে। বেঁচে থাকবেন ইতিহাসের সৃষ্টি এবং স্রষ্টারূপে। কারণ স্বপ্নদ্রষ্টারা কখনো মৃতের তালিকায় থাকেন না; থাকতে পারেন না। আর তাইতো কবির উচ্চারণ–

আলজিয়ার্সে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে বক্তৃতা দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু, ১৯৭৩

তুমি সেই নাম
বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান
এই বাঙালির
অস্তিত্ব ও চেতনায় বহমান।
তুমি অম্লান
অমলিন অক্ষয়
জয় বাংলার
জয় মুজিবের জয়।

লেখক: প্রাবন্ধিক, গবেষক ও মিডিয়াকর্মী

প্রবন্ধ

বঙ্গবন্ধুর প্রিয় পঙ্‌ক্তিমালা

অনুপম হায়াৎ

বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিশক্তি ছিল বিশ্বকোষতুল্য। তিনি স্মৃতি থেকে শৈশব-কৈশোর-ছাত্র-রাজনৈতিক জীবনের বহু পুরনো বন্ধুবান্ধবকে যেমন চিনতে পারতেন, তেমনি কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা সন-তারিখসহ এবং পঠিত কোনো বইয়ের নাম, কবিতা ও গানের লাইন অবলীলায় আবৃত্তি ও উচ্চারণ করতে পারতেন। পরবর্তীকালের ইতিহাস সে সাক্ষ্যই দেয়। শহিদ হওয়ার অনেক বছর পর তাঁর লেখা প্রকাশিত *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (২০১২) ও

কারাগারের রোজনামচা (২০১৭) এর উজ্জ্বল নিদর্শন। বিভিন্ন লেখক-গবেষক-স্মৃতিকারদের সূত্রে জানা যায়, বঙ্গবন্ধু রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও অন্যান্য লেখকের প্রচুর বই পড়তেন বন্দিজীবন ও মুক্তজীবনে। তাঁর বাড়ি ও দলীয় কার্যালয়ে পাঠাগারও ছিল।

বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে অনেক কবিতা ও গানের লাইন উচ্চারিত হতে অনেকে দেখেছেন। তিনি সেসব কবিতার লাইন ভাষণ দেওয়ার সময় অবলীলায় উচ্চারণ করেছেন। আবার একান্ত আপনমনে গুনগুন করে গেয়েছেন কোনো গানের কলি। জেলখানা থেকে মুক্ত হওয়ার সময়ও উচ্চারণ করেছেন কোনো কবির লেখা। বঙ্গবন্ধু কবিতা ভালোবাসতেন, সংগীত ভালোবাসতেন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধুর মুখ থেকে উচ্চারিত কিছু প্রিয় কবিতা ও গানের উল্লেখ করা হলো নানা সূত্রের আলোকে। ১৯৭৩ সালে বার্লিনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব যুব উৎসবে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের সামনে বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিতে গিয়ে খুব সুন্দরভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় উল্লেখ করেছিলেন–

বাংলা কবির দেশ, কবিতার দেশ
বাংলা বিপ্লবীর দেশ, বিপ্লবের দেশ
বাংলা ভাবুকের দেশ, ভাবনার দেশ
বাংলা শিল্পীর দেশ, শিল্পের দেশ
বাংলা সোনার দেশ, রুপার দেশ
বাংলা ঐতিহ্যের দেশ, ইতিহাসের দেশ।

বঙ্গবন্ধুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক কবিতা ও গানের লাইন মুখস্থ ছিল। তিনি তাঁর নান্দনিকতাবোধ ও দেশপ্রেমের চেতনা থেকেই রবীন্দ্রনাথ রচিত 'আমার সোনার বাংলা' গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে অনুমোদন করেছিলেন। আবার একই বোধ থেকে তিনি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'চল চল চল' গানটি বাংলাদেশের রণসংগীত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, বঙ্গবন্ধুর আরেকটি প্রিয় গান ছিল দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত দেশাত্মবোধক সংগীত 'ধন-ধান্য-পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' এই গানটির মধ্যে বর্ণিত :

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ভাষণদানকালে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় জনগণ ও প্রশাসনের সহায়তা গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেছিলেন। তিনি তখন রবীন্দ্রনাথের কবিতার চরণ উদ্ধৃত করে বলেছিলেন–

... আপনাদের এই দান পরিশোধের সাধ্য আমাদের নেই। কবিগুরুর ভাষায় বলতে পারি:

নিঃস্ব আমি রিক্ত আমি
দেবার কিছু নাই,
আছে শুধু ভালবাসা,
দিলাম আমি তাই।

একই ভাষণে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের শত্রু সাম্রাজ্যবাদীদের লক্ষ্য করে কবিগুরুর কবিতার লাইন উচ্চারণ করে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন,

নাগিনীরা দিকে দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস
শান্তির ললিতবাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।
যাবার বেলায় তাই ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হইতেছে ঘরে ঘরে।

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিলেন কলকাতার ড. রমা চৌধুরী। তাঁর সূত্রে জানা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন চরম রবীন্দ্র-ভক্ত। তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে যান। তিনি দেখেন, রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা বঙ্গবন্ধু তাঁর গণভবনস্থ অফিস কক্ষে বাঁধিয়ে রেখেছিলেন। কবিতাটির অংশ বিশেষ রমা চৌধুরী উদ্ধৃত করেছেন–

অবসান হল রাতি
নিভাইয়া ফেল কালিমা-মলিন
ঘরের কোণের বাতি।
নিখিলের আলো পূর্ব-আকাশে
জ্বলিল পুণ্যদিনে।
এক পথে যারা চলিবে তাহারা
সকলের দিক চিনে।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন সুআবৃত্তিকারও। রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুর সহকারী প্রেস সচিব সূত্রে জানা যায়, ১৯৭৫ সালের ৮ই মে-এর একটি ঘটনার কথা তিনি লিখেছেন–

'ভোরবেলা... বঙ্গবন্ধু জাহাজের ডেকে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে একা বসে আছেন। এত সকালে আর কেউ তখনও ঘুম থেকে ওঠেননি। আমি নীরবে গিয়ে তাঁর একপাশে দাঁড়ালাম, দেখলাম তিনি পা দোলাতে দোলাতে আবৃত্তি করছেন-নম নম নম সুন্দরী মম, জননী বঙ্গভূমি...।

তোফায়েল আহমদ সূত্রে জানা যায় আরো অনেক তথ্য। তিনি লিখেছেন–

'বঙ্গবন্ধুর কথা এবং বক্তৃতায় প্রায় সময়ই উদ্ধৃত হতো রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত-জীবনানন্দের কবিতার চরণ। এত সাবলীল আর প্রাসঙ্গিকতায় তিনি কবিতা আবৃত্তি করতেন, মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে হতো। মনে পড়ে ১৯৭১-এর রক্তঝরা মধ্য মার্চের কথা। যখন ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা চলছে তখন সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে নজরুলের কবিতা থেকে বলতেন, 'আমি নরকে বসিয়া হাসি মৃত্যুর হাসি'। কবিগুরুর কবিতা থেকে বলতেন, 'চারিদিকে নাগিনীরা ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস, শান্তির ললিতবাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস'।

বাংলাদেশে ফিরে আসার পর জাতীয় কবিকে স্বাগত জানান বঙ্গবন্ধু

সে সময় অগ্নিঝরা মার্চে একদিকে চলছে আলোচনার নামে ইয়াহিয়ার প্রহসন, অন্যদিকে যুদ্ধপ্রস্তুতি। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আমরা প্রতিদিন ঐক্যবদ্ধ হচ্ছি, সারাদেশে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলার কাজ পূর্ণোদ্যমে এগিয়ে চলছে।

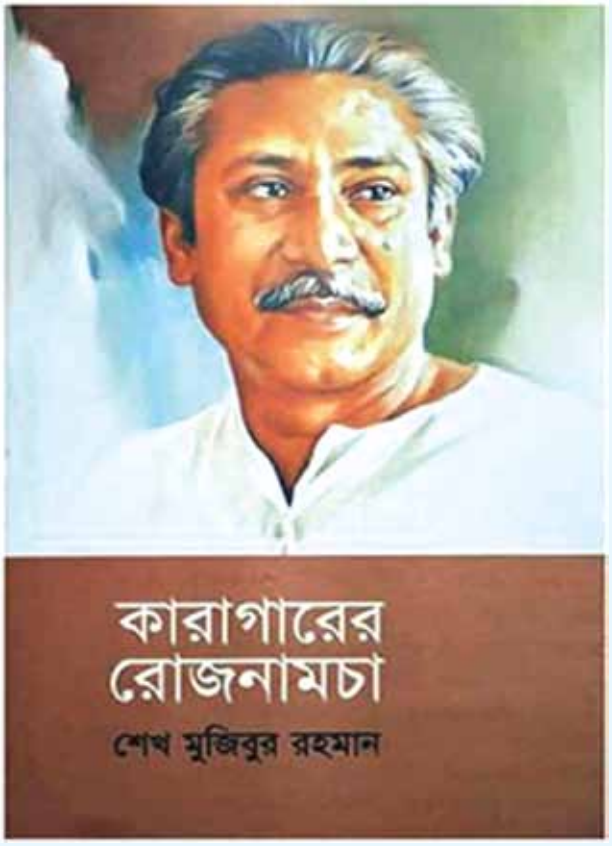

এমতাবস্থায়, রবীন্দ্রনাথ-নজরুল ছিল নেতার অভয়মন্ত্র। এই মার্চেই টঙ্গীতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গুলিতে বহু শ্রমিক হতাহত হয়। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের এক বিশাল মিছিল ভয়াল গর্জনে সমবেত হয় বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে। উত্তেজিত শ্রমিক শ্রেণির উদ্দেশে বক্তৃতাদান শেষে বিদ্রোহী কবিকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত, যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না, অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না...।' আশ্চর্যরকম অবলীলায় পরিস্থিতি-পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করে মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তি নিয়ে তিনি এইসব কাব্যাংশ উচ্চারণ করে যেতেন।

দীর্ঘ ২৩ বছর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর স্বৈরতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে জাতির পিতা যে শিক্ষা অর্জন করেছিলেন, সেই চেতনায় স্বাধীন বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে তিনি জনগণের বাহিনী বলে উল্লেখ করেছিলেন। বক্তৃতায় তিনি বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর অভিপ্রায় ব্যক্ত করে, সেনা সদস্যদের আদর্শবান হওয়ার, সৎপথে থাকার অঙ্গীকার করার আহ্বান জানিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কবি জীবনানন্দ দাশের জননী কবি কুসুমকুমারী দাশের কবিতা থেকে উদ্ধৃত করেছিলেন, 'মুখে হাসি বুকে বল তেজে ভরা মন, মানুষ হইতে হবে মানুষ যখন'।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন পরশপাথরের মতো। তাঁর ছোঁয়ায় গোটা বাঙালি জাতি নিরস্ত্র থেকে সশস্ত্র হয়েছিলাম; অচেতন থেকে সচেতনতার এমন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলাম যে, আমরা স্বপ্ন দেখতাম শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের। 'ঐতিহাসিক গণমহাসমুদ্রে তিনি বলেছিলেন, 'সাত কোটি সন্তানের, হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি'। অশ্রুসিক্ত নয়নে উচ্চকিত হয়েছিলেন এই বলে যে, 'কবিগুরু, তুমি এসে দেখে যাও, তোমার বাঙালি আজ মানুষ হয়েছে, তুমি ভুল প্রমাণিত হয়েছ, তোমার কথা আজ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে'।

আমাদের প্রত্যাশা, এমনি আরো বহু কবিতা ও গানের কথা জানা যাবে ভবিষ্যতের গবেষণায়।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের ইতিকথা

জয়া সূত্রধর

যাঁর একটি মাত্র ভাষণ যখন বিশ্বদরবারে পুরো একটি দেশের সংস্কৃতি তুলে ধরার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়, একটি নামের সাথে একটি দেশের পরিচিতি মিশে থাকে, একজন ব্যক্তি যখন একটি স্বাধীন-সার্বভৌম ভূখণ্ডের সমগ্র জনগোষ্ঠীর জাতীয়তার আদর্শ হয়ে অমরত্ব লাভ করে তখন নতুন করে তাঁকে জানার প্রয়োজন হয় না।

রাজশাহী সফরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান, ১৯৫৪

আমরা গর্বিত জাতি যে, সমস্ত বিশ্ব যাকে নিয়ে গবেষণা করে বিস্মিত, আমরা তাঁর সোনার বাংলায় জন্মগ্রহণ করে তাঁকে জাতির পিতা হিসেবে পেয়েছি। এ দেশমাতৃকাকে শত্রুমুক্ত করতে অসংখ্য বার নিজের জীবন বিপন্ন করে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন বিভিন্ন আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধের। তিনি বাঙালির অস্তিত্বের সাথে মিশে থাকা বাংলার কিংবদন্তি নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২০ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ৫৫ বছর জীবনকালের মধ্যে (১৯৪০-১৯৭৫) ৩৫ বছরই ছিল তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ব্যাপ্তিকাল। সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও নিজস্ব মেধা, প্রজ্ঞা, আশ্চর্য সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব আর প্রবল দেশপ্রেমের কারণে রাজনীতির শীর্ষে পৌঁছেছিলেন তিনি।

১৯৪০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেওয়ার মাধ্যমে রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধুর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

তিনি ১৯৪৩ সালে বেঙ্গল মুসলিম লীগে যোগ দেন। বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়ে জড়িয়ে পড়েন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে। এ আন্দোলনের মুখ্য বিষয় ছিল, অবিভক্ত ভারত থেকে একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা। একই সময় তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্যে আসেন। উল্লেখ্য, কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে আইন বিষয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় ১৯৪২ সাল থেকে পুরোপুরিভাবে তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান-ভারত বিভক্তির পর গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসেন এবং একই বছর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসের ৪ তারিখে 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' নামে স্বতন্ত্র দল প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব পাকিস্তানের দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও নিম্ন জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ছিল এ দলের অন্যতম লক্ষ্য।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈরী ও বিমাতাসুলভ আচরণ শুরু করল। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন গণপরিষদের অধিবেশনে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেয়। এ বক্তব্যের প্রতিবাদে ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের পরই সর্বসম্মতিক্রমে গঠিত হয় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। বঙ্গবন্ধু এই পরিষদের মাধ্যমে বাংলা ভাষা আন্দোলনের জন্য ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করেন। ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করার পর বঙ্গবন্ধু এ দলে যোগ দেন। তিনি দলের পূর্ব পাকিস্তান অংশের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন পুনরায় উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে স্বীকৃতি দেয়। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের কাছে বাংলা ভাষা বিলুপ্ত করার এ ঘোষণায় গ্রামে-শহরে সর্বত্র মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল। ৫২'র ভাষা আন্দোলনের অনেক আগে থেকেই মিথ্যা মামলায় কারাগারে বঙ্গবন্ধুকে আটক করে রাখা হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু জেল থেকেই রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদকে আন্দোলন বেগবান করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিলেন। প্রতিবাদস্বরূপ নিজেও কারাগারের ভেতরে ১৪ই ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন শুরু করেন। বাইরেও অদম্য আন্দোলন শুরু হলো। সমস্ত পূর্ব পাকিস্তান বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঢাকার রাস্তায় ভাষার দাবিতে বিশাল মিছিল বের

হয়। পাকিস্তানিবাহিনী সে মিছিলের ওপর গুলিবর্ষণ করে রফিক, সালাম, জব্বার, বরকতসহ কেড়ে নেয় নাম না জানা আরো অনেকের জীবন।

রক্তরঞ্জিত ভাষা আন্দোলনের সফলতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জনপ্রিয়তা অধিকতর বৃদ্ধি পায়। ১৯৫২ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি জেল থেকে মুক্ত হন তিনি। ১৯৫৩ সালে তিনি দলের কাউন্সিলে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালের ১০ই মার্চ সাধারণ নির্বাচনে গোপালগঞ্জ আসনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে প্রাদেশিক সরকারের কৃষি ও বনমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৫৫ সালের ৫ই জুন তিনি গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। সেইসাথে একই বছরে দলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালে কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রমদপ্তরের মন্ত্রিত্ব লাভ করেন।

১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান স্বৈরশাসকের পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবহেলা আর অধিকার বিষয়ক মতবিরোধের জের ধরে বঙ্গবন্ধুর প্রতি দমননীতি ও নিপীড়ন অব্যাহত রাখে। কিন্তু প্রাদেশিক অধিকারের প্রশ্নে তিনি অটল থেকেছেন। ১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির মুক্তি সনদ নামে খ্যাত ঐতিহাসিক ৬ দফা পেশ করেন। এটি ছিল একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনকে মূল দাবি রেখে লাহোরে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু ৬ দফা সংবলিত দাবি পেশ করেন। বাঙালির স্বাধীকার আন্দোলনের এটিই প্রথম প্রামাণ্য দলিল। ৬ দফা দাবি পেশ করার পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলা সফর করে বাঙালিদেরকে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চেতনায় উজ্জীবিত করে তোলেন।

পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসনের দাবি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে দেখে পাকিস্তান সরকার ১৯৬৮ সালে রাষ্ট্রদ্রোহী ঘোষণা করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় সরকার। উচ্ছ্বসিত জনগণ ২৩শে ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে তাঁকে সংবর্ধনা দেয়। উক্ত সংবর্ধনা সভায় বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সহচর তৎকালীন ডাকসুর ভিপি, বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন।

৫ই ডিসেম্বর ১৯৬৯ সাল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম পূর্ব বাংলার পরিবর্তে 'বাংলাদেশ' শব্দটি ব্যবহার করেন।

১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। কিন্তু জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলেও পাকিস্তান সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরে তালবাহানা শুরু করে। পাকিস্তানের সর্বাধিক আসন লাভকারী ভুট্টো আওয়ামী লীগের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তাব দেয়। বঙ্গবন্ধু এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দাবি করেন, আওয়ামী লীগের কাছেই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। ১৯৭১ সালের মার্চের প্রথম সপ্তাহে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতাকামী মানুষের বিক্ষোভ, হরতাল সারাদেশে অচলাবস্থার সৃষ্টি করল। এরমধ্যে বঙ্গবন্ধু গড়লেন নতুন আরেকটি ইতিহাস। উত্তাল মার্চের ৭ তারিখে রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার সমাবেশ থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' তাঁর বজ্রকণ্ঠের শাণিত আহ্বানে লক্ষ লক্ষ লোক স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়। পরিস্থিতি আন্দাজ করতে পেরে ১৬ই মার্চ থেকে ২৪শে মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া, ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে শর্তসাপেক্ষে ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে আলোচনা করে। কিন্তু স্বাধীনতা ও জনগণের প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু ছিলেন আপোশহীন। ফলে আলোচনা ব্যর্থ হয় এবং ২৫শে

মার্চ রাতে ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করে। বঙ্গবন্ধু ২৫শে মার্চ রাতেই স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। আর ওদিকে একই রাতে পাকিস্তানের বর্বর সামরিকবাহিনী 'অপারেশন সার্চ লাইট' নামে এক বিভীষিকাময় অভিযানে ঘুমন্ত নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙালির ওপর চালায় পৃথিবীর নিকৃষ্টতম হত্যাযজ্ঞ। গ্রেফতার করে বাংলার পিতাকে। 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে'– বঙ্গবন্ধুর এমন সরল আহ্বান আমজনতাকে দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সৈনিকে পরিণত করেছিল। ১০ই এপ্রিল গঠিত হয় মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের অস্থায়ী 'মুজিবনগর সরকার'। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, মুক্তিবাহিনী সংগঠন ও সমন্বয়, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন আদায়, যুদ্ধে প্রত্যক্ষ সহায়তাকারী রাষ্ট্র ভারতের সরকার ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক রক্ষা ইত্যাদি বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করে এই মুজিবনগর সরকার।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে প্রায় দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী যুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে ১৬ই ডিসেম্বর আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি।

স্বাধীনতা অর্জনের পর বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গঠনের কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়ন করেন। কিন্তু ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, দারিদ্র্য, অস্থিরতা, অরাজকতা এবং ব্যাপক দুর্নীতির ফলে যুদ্ধোত্তর দেশ জুড়ে এক কঠিন অবস্থা বিরাজ করে। ১৫ই আগস্ট রাষ্ট্রবিরোধী একটি চক্র বাসভবনে প্রবেশ করে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের উপস্থিত সকল সদস্য, আত্মীয়, কর্তব্যরত কর্মকর্তা কর্মচারীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। ইতিহাস কলঙ্কিত করে। পরবর্তীতে ইতিহাস বিকৃতির অপপ্রয়াসও করা হয়েছে। কিন্তু সত্য তার চিরন্তন নিয়মেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। দেশের মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, দেশের প্রতি অসীম মমত্ববোধ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার স্পৃহা তাঁকে অমর করে তুলেছে। বিশ্ব মানবতার কাছে তিনি আজ প্রেরণার উৎস, প্রতিবাদের স্মারক। তিনি বঙ্গবন্ধু, তিনি বাঙালি সভ্যতার স্থপতি, স্বাধীনতার জনক, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। (উপাধি: বিবিসি জরিপ, ১৪ই এপ্রিল ২০০৪), জাতির পিতা (উপাধি: ৩রা মার্চ ১৯৭১) হয়ে অনন্তকাল অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে থাকবেন বাংলাদেশের জন্ম ও তার আদি সময়ের সাথে।

লেখক: গল্পকার ও প্রাবন্ধিক

বঙ্গবন্ধুর মতোই কিংবদন্তি যে ভূষণ

রহিমা আক্তার মৌ

বাঙালির মুক্তির সনদ তৈরি করতে যিনি নিজের জীবনকে ভয়হীন চিত্তে আন্দোলনের দিকে নিয়ে গেছেন। গণতান্ত্রিক নেতারূপে যেমন তিনি সবার কাছে জনপ্রিয় হয়েছেন তেমনি কণ্ঠস্বর দিয়ে সেই আন্দোলনে শান দিতে তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদে এনেছিলেন নতুনধারা। এই পোশাক যেন তাঁকেই মানায়। এমন একজন সিংহপুরুষের জন্যেই যেন এই সাদা-কালোর পোশাক সার্থকতা বহন করছে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ। বলছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা।

৯ই মার্চ ১৯৬৯, রাওয়ালপিন্ডিতে গোলটেবিল বৈঠকে যাওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধু নিজের দেশ, দেশের মানুষ ও সংস্কৃতিকে মনেপ্রাণে লালন করতেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যেই সেইসব স্বদেশি ছাপ লক্ষ করা গিয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর কাছে যা যা প্রিয় ছিল, তাই দেশের অসংখ্য মানুষের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে। বঙ্গবন্ধুর বিশেষ পোশাক ছিল সাদা পাঞ্জাবি-পায়জামা আর ছয় বোতামের কালো কোট। যে কোটটি পরবর্তীতে 'মুজিব কোট' নামে বেশি পরিচিতি পায়। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং তাঁকে যারা ভালোবাসতেন তারাই পরবর্তীতে এই 'মুজিব কোট' ব্যবহার করতেন। বর্তমানে তরুণ প্রজন্মের মাঝেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এই 'মুজিব কোট'। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর আদর্শে যারা রাজনীতি করছেন তারাও এই কোটকে ব্যবহার করছেন। বঙ্গবন্ধুর ভক্তদের কাছে এই কোট ধারণ করা মানেই বঙ্গবন্ধুকে ধারণ করার শামিল। পায়জামা-পাঞ্জাবির সাথে মুজিব কোট ছাড়াও মোটা ফ্রেমের কালো চশমা, চুরুটের পাইপও বঙ্গবন্ধুর আইকন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

প্রথম জীবনে বঙ্গবন্ধু কিন্তু এই কোট ব্যবহার করতেন না, শুধুই ছিল পাঞ্জাবি-পায়জামা। ব্রিটিশ স্বদেশি আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর পোশাকে স্বদেশি ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট দেশ বিভাগ, পাকিস্তানি রাষ্ট্রের উদ্ভব, ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন মুসলিম লীগ বিরোধ এবং আওয়ামী লীগ গঠন, '৫২-র ভাষা আন্দোলন, অতঃপর জেল জীবন শুরু হয় এই মহান নেতার। সম্ভবত এ সময়েই তাঁর মধ্যে এ বঙ্গের স্বাধীনতার চিন্তা এবং আন্দোলনের পরিকল্পনার স্তরগুলো উদ্ভাসিত হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৬৬'র ছয় দফা এবং ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের পরবর্তী পর্যায়ে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ইতিহাস পাঠ করে বা ছবির অ্যালবাম দেখে অনুমানের ভিত্তি ও অনেকের মতে, ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পর জেল থেকে যখন দেশে আসেন বঙ্গবন্ধু তারপরই নিয়মিত এই কালো কোট পরতে থাকেন, যা পরবর্তী সময়ে তাঁর অনুসারী ও সহযোদ্ধারা পরতে শুরু করেন। তখন এই মুজিব কোট শুধু একটি ফ্যাশন হিসেবে নয়, বরং রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রতীক হিসেবেও বিস্তার লাভ করে।

এই মুজিব কোটে ছিল ৬টি বোতাম। মুজিব কোটের ৬ বোতাম মানেই শেখ মুজিবের ৬ দফা। স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্বে শেখ মুজিবের গায়ের কোটটি মুজিব কোট হিসেবে তেমন খ্যাতি লাভ করেনি। কালো হাতা কাটা এই বিখ্যাত কোটটি তখনো লাভ করেনি কালজয়ী কোনো নাম। মওলানা ভাসানী এবং শামসুল হক যখন আওয়ামী মুসলীম লীগ গঠন করলেন তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংগঠনটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন। ধারণা করা হয়, তখন থেকেই বঙ্গবন্ধুকে এই কোট পরতে বেশি দেখা যায়। এই কোটটির প্রচলন 'নেহেরু কোট' থেকে। ভারত উপমহাদেশ স্বাধীনের সময় জওহরলাল নেহেরুর (স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী) ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে এই নেহেরু কোটের প্রচলন শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু এই কোটটি পড়তেন বলেই এর নাম দেওয়া হয় 'মুজিব কোট'। বঙ্গবন্ধু স্বভাবতই তাঁর পছন্দের সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবির মতোই কোটটি ব্যবহার করতেন।

রাজনৈতিক মতাদর্শের মিল না থাকলেও বিশ্বে যেসব রাজনৈতিক নেতার ব্যক্তিত্ব ও তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ আজও আমাদের মনের ভেতরে গেঁথে আছে তাদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর পোশাক অন্যতম। এ যেন এক সিংহপুরুষের পোশাক। পায়জামা-পাঞ্জাবির সাথে কালো কোট, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, হাতে বা ঠোঁটে পাইপ এমন ব্যক্তিত্ব বিশ্ব রাজনীতিতে বিরল। ব্যক্তিকে নিয়েই ব্যক্তিত্ব। মানুষ বিভিন্ন অবস্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় বিভিন্নভাবে আচরণ করে থাকে– এটাই স্বাভাবিক। মানুষের সব আচরণের সমষ্টিই হলো ব্যক্তিত্ব। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ।

বঙ্গবন্ধুর নিজ দেশ তথা মানুষের কৃষ্টি-কালচার ও পোশাক-আশাক নিয়ে ছিল আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি। এরই প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৭০

আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সালের ৩১শে ডিসেম্বর হোটেল পূর্বাণীতে দেওয়া তাঁর এক বক্তৃতায়। যেখানে তিনি বলেন–

'বাংলাদেশের মানুষের রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না বলেই বাংলা সংস্কৃতির বিকাশ হয়নি। যে সংস্কৃতির সাথে দেশের মাটি ও মনের সম্পর্ক নেই, তা বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না'।

ইতিহাস থেকে দেখলে, মুজিব কোটের সঙ্গে জওহরলাল নেহেরুর ব্যবহৃত ফুলহাতা জ্যাকেট এবং মুজিব টুপির সঙ্গে সুভাষ বসুর আজাদ-হিন্দ ফৌজের টুপির বেশ মিল রয়েছে। তখন এসব জ্যাকেট-টুপি ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে ভারতীয় কংগ্রেস অনুসৃত ভারতীয় জাতীয়তার স্মারক চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সেগুলোই সামান্য পরিবর্তিত চেহারায় বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে নতুনভাবে জেগে উঠতে শুরু করে। যার বিশেষত রূপ হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'মুজিব কোট' বাংলাদেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

বঙ্গবন্ধুর হাতাবিহীন কালো কোট, হাইনেক, নিচে দুটি পকেট– এই পোশাক বঙ্গবন্ধুকে করেছে সবার চেয়ে আলাদা। এই পোশাক দেখলে বোঝা যেত ওইতো মুজিব! বঙ্গবন্ধু এদেশের মানুষের মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং গণতন্ত্রের চেতনা সঞ্চার করতে চেয়েছেন। দেশের গণমুখী সংস্কৃতিকে বিকশিত করার উদ্দেশ্যে সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা, ফ্যাশন; যা কবি, শিল্পী ও ডিজাইনারদের সুপ্ত শক্তি ও স্বপ্ন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠবে বাংলার নিজস্ব সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পোশাক-আশাক- এটাই ছিল তাঁর চিন্তায়।

বিশ্বে যেসব রাজনৈতিক নেতার ব্যক্তিত্ব ও তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ আজও আমাদের মনের ভেতরে গেঁথে আছে, তাঁদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর পোশাক অন্যতম। মুজিবকে ভালোবেসে তাঁর পোশাক পরা কোনো অন্যায় কিছু নয়। কিন্তু মুজিবকে ভালোবাসলে আগে অবশ্যই তাঁর আদর্শ, তাঁর জীবনযাপন, ধ্যানধারণাকে ভালোবাসতে হবে। আমরা এই পোশাকের মাঝে আমাদের প্রিয় নেতার আদর্শকে সংরক্ষণ করতে চাই। বঙ্গবন্ধু এমন এক নেতা যিনি নিজের দেশের মাটি ও মানুষের সাথে মিশে কৃষ্টি ও কালচারকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছিলেন। তাঁর মতো স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের এমন রাজনৈতিক নেতা বিশ্বে দুর্লভ।

লেখক: সাহিত্যিক, কলামিস্ট ও প্রাবন্ধিক

৮৮তম জন্মবার্ষিকী

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা

মোনাজিনা জান্নাত

সাহসিকতা, বীরত্ব, দেশপ্রেম, দূরদর্শিতা দিয়ে কেউ যুদ্ধ করে সামনে থেকে। যুদ্ধের ময়দানে তার রণহুংকার ছত্রভঙ্গ সহযোদ্ধাদের একসূত্রে গ্রথিত করে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস জোগায়। তাঁদের আমরা বলি বীর, সেনাপতি অথবা নেতা। সম্মুখ সমরে অংশ নেওয়া এসব জাতীয় নেতা আমাদের পরম শ্রদ্ধার পাত্র। জাতির দুর্দিনে, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে দৃঢ়তা, মানবিকতা, সহনশীলতার অনবদ্য উদাহরণ সৃষ্টি করেন তাঁরা। এই নেতাদের পেছনেই নীরবে নিভৃতে কাজ করে যান কিছু মানুষ। তাঁরা আড়ালে থেকে পরোক্ষভাবে নেতাকে সঠিক পথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে কাজ করেন। কখনোবা নেতার ছায়াসঙ্গী হয়ে তাঁকে সাহস জুগিয়ে, নিজের আকাঙ্ক্ষাকে তুচ্ছ করে দেশের বৃহত্তর কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেন- তাঁরাও যোদ্ধা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এমন একজন যোদ্ধাকে তাঁর জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলেন। তিনি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা। মা তাঁকে আদর করে ডাকতেন রেণু। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক জীবনে যিনি ছায়াসঙ্গী হয়ে পথ দেখিয়েছেন সত্য ও ন্যায়ের। জীবনের প্রতিটি পরতে বঙ্গবন্ধু যার মমতার ছায়ায় নির্ভরতা খুঁজে পেয়েছেন। ৮ই আগস্ট ছিল এ মহীয়সী নারীর ৮৮তম জন্মদিন। ১৯৩০ সালের ৮ই আগস্ট গোপালগঞ্জের মধুমতী নদীর তীরঘেঁষা টুঙ্গিপাড়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শেখ জহুরুল হক, মাতা হোসনে আরা বেগম। সম্পর্কে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চাচাতো বোন। মাত্র তিন বছর বয়সে তিনি বাবাকে এবং পাঁচ বছর বয়সে মাকে হারান। রেণু শৈশবে শেখ মুজিবের মাতা সায়েরা খাতুনের অন্যান্য সন্তানদের সাথে একসাথে বড়ো হন। তখনকার দিনে মুসলিম ঘরের মেয়েরা বাড়ির বাইরে স্কুলে লেখাপড়া করত না বলে তাঁরও আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব হয়নি। প্রথমদিকে বাড়ির কাছে একটি পাঠশালায় কিছুদিন লেখাপড়া করেন রেণু। তাছাড়া বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাছে বাংলা, অঙ্ক, ইংরেজি পড়তেন; মৌলবী সাহেব ধর্ম শিক্ষা দিতেন। ছোটোবেলা থেকেই রেণু ছিলেন শান্ত স্বভাবের, অসীম ধৈর্যশীল এবং বুদ্ধিমতী। বড়ো হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর মায়ের কাছ থেকে ধর্ম-কর্ম, সেলাই, রান্নাবান্না এবং সংসারের নিয়মনীতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। শেখ মুজিবের বয়স যখন কুড়ি বছর তখন তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে হয়।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা রেণু শৈশব থেকে স্বামীর সঙ্গে একত্রে মানুষ হয়েছেন বলে শেখ মুজিবের স্বভাব, চিন্তাভাবনাকে খুব ভালো করে জানতেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গৌরবগাথা তিনি গভীর আগ্রহে স্বামীর কাছে শুনতেন। শেখ মুজিব যখন কলকাতায় কলেজে লেখাপড়া ও ছাত্র রাজনীতি করতেন, তখনো স্বামীকে অনুপ্রেরণা জোগাতেন রেণু। অনেক সময় প্রয়োজনে নিজের জমির ধান বিক্রির অর্থ পাঠিয়ে স্বামীকে সহযোগিতা করতেন। এভাবে তিনি বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তি জীবন এবং রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ের সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি শুধু বঙ্গবন্ধুর জীবনে অনুপ্রেরণাই ছিলেন না তিনি একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারীও ছিলেন। শেখ ফজিলাতুন নেছা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেলে থাকা অবস্থায় সন্তানদের মানুষ করা, ঘর সংসার সামলানো, মামলার খোজখবর নিতে আইনজীবীদের সঙ্গে দেখা করাসহ, দলীয় নেতাকর্মীদের দেখভালও করতেন। বঙ্গবন্ধুকে পরামর্শ দিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতেও সাহায্য করতেন তিনি। তাই বলা যায়, বঙ্গবন্ধুর সাফল্যের নেপথ্যের কারিগর ছিলেন শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব।

স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রত্যয়ে বঙ্গবন্ধুকে বার বার কারাবরণ করতে হয়েছে। বার বার নিগৃহীত হতে হয়েছে তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কাছে। যখন শাসকদের ধৃষ্টতা চরম আকার ধারণ করে তখন প্রকাশ্য স্বাধীনতার ডাক দেওয়ার প্রয়োজন হয় সময়ের দাবি। জাতি পায় ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার আহ্বান। '৭১-এর ৭ই মার্চে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দেওয়া বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালির কাছে পৌঁছে দেয় স্বাধীনতার বার্তা। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণের ছিল না কোনো লিখিত পাণ্ডুলিপি। এটি ছিল চেতনা থেকে উচ্চারিত স্বপ্রণোদিত স্বাধীনতার ঘোষণা। এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু কী বলবেন সেই সম্পর্কে পূর্ব প্রস্তুতিও ছিল না। বঙ্গমাতা তাঁকে সাহস জোগালেন, 'মনে রেখো, তোমার সামনে আছে জনতা এবং পেছনে বুলেট। তোমার মন যা চাইছে তুমি শুধু সেটাই আজ বলবে'। শেখ মুজিবের সাহসিকতা এবং দূরদর্শিতার ওপর যথেষ্ট আস্থা ছিল তাঁর। শেখ মুজিবের স্ত্রী এবং সহযাত্রী হিসেবে বাংলার স্বাধীনতা ও বাঙালির প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁরও লক্ষ। তাই ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধু কী বলবেন জনতাকে তা তাঁর রেণুকেও আলোড়িত করেছিল।

লন্ডনে চিকিৎসারত স্বামীর পাশে বেগম মুজিব

শেখ মুজিবের রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে গড়ে ওঠার পেছনে ফজিলাতুন নেছার একটি দৃঢ়চেতা দরদি মন ছিল। তিনি বুঝতেন নিজের জীবন উৎসর্গ করে হলেও শেখ মুজিব বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করবেন। তাই তিনি কোনো পিছুটান রাখতে দেননি। সংসারের সবকিছু তিনিই দেখতেন। সেখানেই ছিল শেখ মুজিবের শান্তি ও স্বস্তি। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পর ঘরে ফিরে তিনি স্ত্রী ও সন্তানদের মাঝে শান্তি-আশ্রয় খুঁজে পেতেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে কোনো লোভ ও ভয় কাবু করতে পারেনি। পাকিস্তানি শাসকবর্গের কাছে মুজিব ছিলেন আতঙ্ক। বাঙালির অধিকার আদায় ছাড়া শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে প্রধানমন্ত্রিত্ব বা ক্ষমতার কোনো আকর্ষণ ছিল না। ফজিলাতুন নেছাও সে আদর্শে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি সন্তানদের এমন করে মানুষ করেছিলেন, যাতে তারা দেশপ্রেমের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়।

১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চ শেষ রাতে পাকিস্তানি সেনারা বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িটি আক্রমণ করে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। তারপর একদিকে মুক্তিযুদ্ধ অন্যদিকে স্বামীর জন্য দুশ্চিন্তায় সময় অতিবাহিত হয়েছে বেগম মুজিবের। অবশেষে ১৯৭২-এর ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে আসলে অশ্রু ও বেদনায় সিক্ত হয়ে ফজিলাতুন নেছা স্বামীকে বীরের বেশে বরণ করে নেন। তারপর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিকে গড়ে তুলতে বঙ্গবন্ধুকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে। নেপথ্যে থেকে সবরকম সহযোগিতা করেন বেগম মুজিব।

৭৫-এর ১৫ই আগস্ট ভোরের আলো ফোটার আগেই বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা, স্বাধীনতা অর্জনের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেশি-বিদেশি শত্রুদের সহযোগিতায় একদল বিপদগামী সেনাসদস্য ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হত্যা করে। হত্যা করে বঙ্গবন্ধুর আজীবনের সঙ্গী, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ও ভালোবাসার সাথি ফজিলাতুন নেছা রেণুকে; তাঁদের তিন পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেলকে, শেখ কামাল ও শেখ জামালের নবপরিণিতা স্ত্রীদের, আত্মীয়স্বজনসহ মোট ১৮ জনকে। নিরীহ মানুষগুলোকে যেভাবে নৃশংস, বর্বরভাবে হত্যা করা হয় তা মানবাধিকারের স্পষ্ট লঙ্ঘন।

শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িটি আজ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর। এ বাড়ির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে রেণুর অসাধারণ সারল্য এবং একজন রাষ্ট্রনায়কের স্ত্রীর সুদৃঢ় সংগ্রামের ছোঁয়া। আমাদের আরো বেদনাহত হতে হয় যখন দেখি, শেখ মুজিবুর রহমান ও ফজিলাতুন নেছা রেণু জীবনেও যেমন দুজনে দুজনার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, সংগ্রামে সাথে ছিলেন তেমনি মরণেও সঙ্গী হয়ে পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নেন। এদেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসার প্রতিদানে তাঁরা অমর হয়ে থাকবেন বাংলার মাটিতে ও আপামর মানুষের হৃদয়ে। [তথ্যসূত্র: মহীয়সী নারী বেগম ফজিলাতুন নেছা, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, এপ্রিল ২০১১]

লেখক: প্রাবন্ধিক

কুরবানি: তাৎপর্য ও আহকাম

মুফতি আবুল হাসান শরীয়তপুরী

কুরবানি আরবি 'কুরব' শব্দ থেকে এসেছে। কুরব শব্দের অর্থ নৈকট্য লাভ। যে বস্তু কারো নৈকট্য লাভের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেটাকে বলা হয় কুরবান। আর তা থেকেই কুরবানি।

শরিয়তের পরিভাষায় কুরবানি বলা হয় ঈদুল আজহার দিনগুলোতে নির্দিষ্ট প্রকারের গৃহপালিত পশু আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য জবেহ করাকে।

ইসলামি শরিয়তে এটি এবাদত হিসেবে সিদ্ধ, যা কোরান, হাদিস ও মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য দ্বারা প্রমাণিত। কোরান মজিদে যেমন এসেছে,

> তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশে নামাজ আদায় কর ও পশু কুরবানি কর। (সূরা কাউসার, ২)

> রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানি করে না সে যেন আমাদের ঈদগাহের ধারে না আসে। (মুসনাদে হামদ, ৬২৫৬)

কুরবানি যাদের ওপর ওয়াজিব

যার ওপর সদকা (ফিতরা) আদায় করা ওয়াজিব, তার ওপর কুরবানি করাও ওয়াজিব। অর্থাৎ কুরবানির তিন দিনের মধ্যে (১০ জিলহজ ফজর থেকে ১২ই জিলহজ সন্ধ্যা পর্যন্ত) যদি কোনো মুসলমান আকিল, বালিগ ও মুকিম ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ি ও আসবাবপত্রের অতিরিক্ত সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা সাড়ে বাহান্ন তোলা রুপা, কিংবা সমমূল্যের টাকা বা যে-কোনো সম্পদ থাকে, তবে তার ওপর কুরবানি ওয়াজিব। কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার জন্য এ মাল-সম্পদ এক বৎসর কাল স্থায়ী হওয়া শর্ত নয়।

কুরবানির ফজিলত

ক. কুরবানিদাতা সাইয়েদুনা হজরত ইবরাহিম আ. ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ বাস্তবায়ন করে থাকেন।

খ. পশুর রক্ত প্রবাহিত করার মাধ্যমে কুরবানিদাতা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নৈকট্য অর্জন করেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

> আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না তাদের গোশত এবং রক্ত, বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া। এভাবে তিনি এগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এজন্য যে, তিনি তোমাদের পথ-প্রদর্শন করেছেন: সুতরাং আপনি সুসংবাদ দিন সৎকর্মপরায়ণদেরকে। (সূরা হজ, ৩৭)

হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

> যে মুমিন বান্দা প্রশস্ত মনে হাসিখুশিভাবে সওয়াবের নিয়তে কুরবানি করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তার এ কুরবানিকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষার জন্য ঢাল স্বরূপ বানিয়ে দিবেন। (ইবনে মাজাহ, ২২৬)

কুরবানির পশু

❑ গরু, মহিষ, উট, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা দ্বারা কুরবানি করা যায়। ছাগল, ভেড়া, দুম্বা এক বছরের এবং গরু, মহিষ দুই বছরের হওয়া উচিত। কিন্তু ভেড়া ও দুম্বা যদি এমন হৃষ্টপুষ্ট হয় যে, ছয় মাসেরটা দেখতে এক বছরের দেখায়, তবে এতেও কুরবানি হয়ে যাবে। (আলমগীরী, ৫/২৯৭; শামী, ৬/৩২১-৩২২)

❑ কুরবানির পশু মোটা-তাজা, হৃষ্টপুষ্ট, সুদর্শন ও দোষমুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। খাসিকৃত পশুর কুরবানি উত্তম। ভেড়া থেকে দুম্বা কুরবানি উত্তম। খাসি থেকে বকরির কুরবানি– এরূপ উট থেকে উটনী এবং ষাঁড় থেকে গাভি কুরবানি উত্তম। (আলমগীরী ৫/২৯৮)

❑ কুরবানির পশু গর্ভবতী বলে জানা গেলেও তার দ্বারা কুরবানি জায়িয তবে গর্ভে বাচ্চা জীবিত পেলে সেটাকেও আল্লাহর নামে যবেহ

করে দিতে হবে এবং শরিকি কুরবানি হলে এটাকেও প্রত্যেকের অংশ হিসেবে পৃথক ভাগ করে দিতে হবে। কেউ ইচ্ছে করলে এর গোশত খেতে পারে। কিন্তু না খেলে কোনো দোষ হবে না। (শামী ৬/৩২২; আযীযুল ফাতাওয়া ২/১৮২; আলমগীরী ৫/২০৪)

❑ কুরবানির জানোয়ারের দ্বারা নিজে উপকৃত হওয়া মাকরূহ। চাই সে ধনী হোক বা গরিব হোক। কুরবানির নিয়তে খরিদকৃত জানোয়ারের দুধও নিজে পান করবে না। গরিবদের মধ্যে দান করে দেবে। (ফাতাওয়া আলমগীরী, ৫/৩০১-৩০২; ফাতাওয়া শামী, ৬/৩২২)

যে সমস্ত ত্রুটিযুক্ত পশু কুরবানি করা জায়িয নয়

❑ অন্ধ, কানা বা খোঁড়া জানোয়ার কুরবানি করা দুরস্ত নয়। (ফাতাওয়া শামী ৫/৩১৬; আলমগীরী ৫/২৯৮)

❑ পশু যদি এমন রুগ্ন ও দুর্বল হয় যে, কুরবানির স্থান পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যেতে পারে না, তাহলে এমন জানোয়ারের কুরবানি জায়িয হবে না। (আলমগীরী, ৫/২৯৮)

❑ জন্তুর কান বা লেজ এক তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে বেশি কেটে গিয়ে থাকলে, তার দ্বারা কুরবানি দুরস্ত নয়। (ফাতাওয়া আলমগীরী, ৫/২৯৮)

❑ যে পশুর মোটেও দাঁত নেই, কিংবা অধিকাংশ দাঁত পড়ে গিয়েছে, তার দ্বারা কুরবানি করা যাবে না। যদি অধিকাংশ দাঁত বিদ্যমান থাকে, তবে কুরবানি জায়িয হবে। (আলমগীরী, ৫/২৯৮)

❑ যে পশুর শিং ওঠেনি, কিংবা ওঠেছিল, কিন্তু উপর থেকে ভেঙে গিয়েছে, তার কুরবানি জায়িয। কিন্তু একেবারে মূল থেকে ভেঙে গিয়ে থাকলে, কুরবানি দুরস্ত নয়। (ফাতাওয়া আলমগীরী, ৫/২৯৮)

❑ যে জানোয়ারের চর্মরোগ হয়েছে, যদি এর প্রতিক্রিয়া গোশত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে থাকে, তবে কুরবানি দুরস্ত নয়, অন্যথায় দুরস্ত আছে। (আহকামে কুরবানি, ৩৬)

কুরবানি করার নিয়ম

কুরবানির জন্তুকে কিবলা রোখ করে শায়িত করার পর প্রথমে এই দোয়াটি পড়বেন-

> আমি একমুখী হয়ে স্বীয় মুখমণ্ডল ঐ আল্লাহর দিকে করেছি, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূখমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকও নই। আমার নামাজ, আমার কুরবানি এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। হে আল্লাহ! এটাকে আপনি আমার পক্ষ হতে কবুল করেছেন আপনার হাবিব হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আপনার খলিল হজরত ইবরাহীম আ.-এর পক্ষ থেকে।

❑ কুরবানি করার সময় মুখে নিয়ত করা এবং দোয়া পড়া জরুরি নয়।

❑ যদি অন্তরে এ ধারণা করে যে, আমি কুরবানি করছি, আর মুখে কিছুই না বলে শুধু 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর' বলে জবেহ করে তবুও কুরবানি জায়েয হবে। তবে যদি সহিহ শুদ্ধভাবে দোয়া স্মরণ থাকে তাহলে পড়ে নেওয়া উত্তম। (ফাতাওয়া শামী, ৫/২৭২; জাওয়াহিরুল ফিকহ, ১/৪৫০)

❑ যে-কোনো হালাল পশুপাখি জবেহ করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে 'বিসমিল্লাহ' ছেড়ে দিলে, জবেহকৃত প্রাণীর গোশত হারাম হয়ে যায়। তা নিজে খাওয়া বা অপরকে খাওয়ানো অথবা বিক্রি করা সম্পূর্ণ নাজায়িয বা হারাম। (ফাতাওয়া আলমগীরী, ৫/২৮৮; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১/৩৫৬)

❑ জবেহকারীর সাথে অন্য কেউ ছুরি চালানোর মধ্যে শরিক থাকলে তার জন্যও 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর' বলা ওয়াজিব। যারা হাত, পা, মুখ ইত্যাদি তারা জবেহের মধ্যে শরিক নয়, বরং তারা শুধু সাহায্যকারী। (ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৩/৫০৭; ফাতাওয়া শামী, ৫/২১২)

❑ জবেহ করার সময় যদি পশুর মাথা শরীর থেকে পৃথক হয়ে যায়, তাহলে হারাম হবে না, হালালই থাকবে এবং কুরবানিও হবে। তবে মাকরূহ হবে। (রদ্দুল মুহতার, ৫/১৮৮)

কুরবানির ওয়াক্ত বা সময়

কুরবানি নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পর্কিত একটি এবাদত। এ সময়ের পূর্বে যেমন কুরবানি আদায় হবে না তেমনি পরে করলেও আদায় হবে না। কারণ কুরবানির কোনো কাযা নেই। তবে কারো ওপরে যদি কুরবানি ওয়াজিব হয়ে থাকে এবং সে কুরবানির দিনগুলোতে কুরবানি না করে তবে পরবর্তীতে তাকে একটি বকরির মূল্য দান করে দিতে হবে। (আলমাবসুত লিসসারাখসী, ৬/২০০৯, আলহিদায়া, ৪/৪৪৪)

যারা ঈদের নামাজ আদায় করবেন তাদের জন্য কুরবানির সময় শুরু হবে ঈদের নামাজ আদায় করার পর থেকে। যদি ঈদের নামাজ আদায়ের পূর্বে কুরবানির পশু জবেহ করা হয় তাহলে কুরবানি আদায় হবে না। হাদিসে এসেছে,

> আল-বারা ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবাতে বলেছেন:
>
> এ দিনটি আমরা শুরু করব নামাজ দিয়ে। অতঃপর নামাজ থেকে ফিরে আমরা কুরবানি করব। যে এমন আমল করবে

সে আমাদের আদর্শ সঠিকভাবে অনুসরণ করল। আর সে এর পূর্বে জবেহ করল সে তার পরিবারবর্গের জন্য গোশতের ব্যবস্থা করল। কুরবানির কিছু আদায় হলো না। (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৯৬৫)।

নামাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে কুরবানির পশু জবেহ করবে না; বরং নামাজের খুতবা দুটি শেষ হওয়ার পর জবেহ করবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা শেষ করে জবাই করেছেন। হাদিসে এসেছে,

> জুনদাব ইবনে সুফিয়ান আল-বাজালী রা. বলেছেন– নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানির দিন নামাজ আদায় করলেন অতঃপর খুতবা দিলেন তারপর পশু জবেহ করলেন। (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৯৮৫)।

❑ কুরবানি কেবলমাত্র তিন দিনের মধ্যে সীমিত। আর কুরবানির দিনগুলো হলো ১০, ১১ ও ১২ জিলহজ। এ তিন দিনের যে-কোনো দিন কুরবানি করা যায়। তবে প্রথম দিন কুরবানি করা উত্তম। তারপর পর্যায়ক্রমে ১১ ও ১২ জিলহজ। উল্লেখ্য, কোনো কারণ ব্যতীত কুরবানি করায় বিলম্ব না করাই উত্তম। (ফাতাওয়া শামী, ৫/৩১৬; ফাতাওয়া আলমগীরী, ৫/২৯৫)

আংশীদারিত্বের কুরবানি

শরিকি কুরবানি বা অংশীদারিত্বের কুরবানি হলে শরিকদের প্রত্যেকেরই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত থাকতে হবে। কেউ যদি কেবল গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্যে কুরবানি করে, তাহলে কারো কুরবানিই দুরস্ত হবে না। (ফাতাওয়া শামী, ৬/৩২৬)

❑ অংশীদারিত্বের কুরবানির গোশত অনুমানের ভিত্তিতে বণ্টন করা যাবে না। বরং পূর্ণমাত্রায় সতর্কতার সাথে সঠিক ও সমভাবে নিক্তিতে ওজন করে বণ্টন করা না হলে কোনো অংশে যদি বেশি-কম হয়ে যায়, তাহলে তা সুদে পরিণত হবে এবং গুনাহ হবে।

❑ মনে করুন সাত জন শরিক মিলে কুরবানি করার জন্য একটা পশু ক্রয় করেছে, কিন্তু পশু জবেহ করার পূর্বে এমন একজন অংশীদার পৃথক হয়ে গেল যার ওপর কুরবানি ওয়াজিব এবং অন্য লোক যদি তার স্থানে শরিক হয়ে যায়, তবে তাদের কুরবানি শুদ্ধ হয়ে যাবে। আর যদি অংশীদারদের মধ্যে থেকে এমন ব্যক্তি জবেহের পূর্বে পৃথক হয়ে যায়, যার ওপর কুরবানি ওয়াজিব ছিল না, তাহলে অংশীদারদের কারো কুরবানি দুরস্ত হবে না। (কিফায়াতুল মুফতী, ৮ম খণ্ড)

❑ স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর কুরবানি করা এবং স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর কুরবানি করা ওয়াজিব নয়। (হিন্দিয়া ৫/১৯৭)

❑ হ্যাঁ, যদি অনুমতি নিয়ে একে অপরের কুরবানি করে তাহলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। (হিন্দিয়া, ৬/১৯৫; শামী, ৫/২০০)

❑ কুরবানিদাতার জন্য কুরবানির গোশত বিক্রি করা হারাম। এতদসত্ত্বেও যদি কেউ বিক্রি করে দেয় তাহলে সেই মূল্য গরিব-মিসকিনদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। ঐ মালিক কোনোমতেই সেই মূল্য ভক্ষণ করতে পারবে না। তবে কোনো ব্যক্তি উক্ত কুরবানির গোশতের মালিক হওয়ার পর সে যদি তা বিক্রি করে দেয় তাহলে তা নাজায়িয হবে না। গরু, মহিষ, উট ইত্যাদির মধ্যে সাত ভাগের বেশি শরিক হয়ে কুরবানি করা জায়িয হবে না। যদি কেউ এমন করে তাহলে তাদের মধ্যে কারো কুরবানি সহিহ হবে না। এমনকি কারো ভাগের মধ্যে যদি অন্য কাউকে শরিক করে তাহলেও জায়িয হবে না। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি সাত ভাগের এক অংশের মধ্যে শরিক হলেও কুরবানি জায়িয হবে না। (জাওয়াহিরুল ফিকহ, ১/৪৫২)

❑ যদি কোনো ব্যক্তির দশজন ছেলে থাকে এবং সকলেই একান্নভুক্ত হয়, তাহলে শুধু পিতার ওপর একটি কুরবানি ওয়াজিব হবে। হ্যাঁ, যদি ছেলেরা নিসাবের মালিক হয়, তাহলে পিতার কুরবানি তাদের জন্য যথেষ্ট হবে না। তাদের আলাদা কুরবানি করতে হবে। (রদ্দুল মুহতার, ৫/২০০)

মান্নতের কুরবানি

❑ কুরবানি মান্নত করলে, মান্নতকারী ধনী হোক বা গরিব হোক, সর্বাবস্থায় তার ওপর কুরবানি ওয়াজিব হয়ে যায়। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ৫/৩৩; বাদায়িউস সানায়ি, ৫/৬১)

❑ মান্নতের কুরবানির গোশত মান্নতকারী ও ধনী ব্যক্তিদের জন্য খাওয়া নাজায়িয। খেয়ে ফেললে, যে পরিমাণ খেয়েছে, তার মূল্য সদকা করে দিতে হবে। (ফাতাওয়া শামী, ৬/৩২১)

❑ কোনো নির্দিষ্ট জন্তুকে কুরবানি করার জন্য মান্নত করলে সেটাকেই কুরবানি করতে হবে। যদি কুরবানির দিন অতিবাহিত হয়ে যায়, কিন্তু জন্তুকে কুরবানি করা হয়নি, এমতাবস্থায় ঐ জন্তুটিকে জীবিত সদকা করে দিতে হবে। (মাহমূদিয়া, ৪/৩০৩; রদ্দুল হুহতার, ৫/২০৪)

❑ নিসাবের মালিক ব্যক্তি যদি বকরা ঈদের পূর্বে কুরবানি করার মান্নত করে, তাহলে তার ওপর দুটি কুরবানি করা ওয়াজিব। একটি নযর বা মান্নতের দ্বিতীয়টি নিসাবের। (শামী, ৫/২২৫)

জবেহের মাসায়িল

❑ জবেহ করার সময় জবেহকারীর মুখ পশ্চিম দিকে করা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। বিনা ওজরে অন্য দিকে মুখ করে জবেহ করা মাকরুহে তাহরীমী। (আলমগীরী, ৫/২৮৮)

❑ নিজের কুরবানি নিজের হাতে জবেহ করা উত্তম। নিজে না জানলে অন্যকে দিয়ে করিয়ে নিবে। তবে জবেহের পশুর কাছে উপস্থিত থাকা উত্তম (শামী, ৬/৩২৮)

❑ জবেহ করার পর পশু একবারে নিস্তেজ হবার পূর্বে তার গলায় ছুরির মাথা দিয়ে আঘাত করা, পায়ের চামড়া কাটা বা চামড়া ছাড়ানো মাকরূহে তাহরীমী। (বাদায়িউস সানায়ি, ৫/৮০)

❑ কুরবানির পশুর রশিসহ সবকিছু দান করে দিতে হবে। (ফাতাওয়া শামী, ৬/৩২৮; আলমগীরী, ৫/৩০০)

চামড়ার মাসায়িল

❑ কুরবানির চামড়া দ্বীনি মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে দান করা উত্তম। কেননা তাতে দুই দিকে সওয়াব অর্জন হয়। এক. গরিবকে দান করার সওয়াব। দুই. দ্বীনি ইলমের প্রচার ও প্রসার। অর্থাৎ দ্বীনের খিদমতের সওয়াব। কিন্তু তা দ্বারা শিক্ষকের বেতন বা অন্য কর্মচারীর পারিশ্রমিক দেওয়া আদৌ জায়িয হবে না। (জাওয়াহিরুল ফিকহ, ১/৪৫৬; সূরা মায়িদা, ২; ইমদাদুল ফাতাওয়া, ২/৩৮)

❑ কুরবানির চামড়া বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব, রাস্তা মেরামত, নির্মাণ করা জায়িয নয়। (ফাতাওয়া শামী, ৬/৩২৮-৩২৯; আহসানুল ফাতাওয়া, ৭/৪৯৫; কিফায়াতুল মুফতী, ৮/২৪২)

❑ পশুর দেহ থেকে চামড়া পৃথক করার পূর্বে তা বিক্রি করা নাজায়িয। (দুরৌ মুখতার ৬/৩২৯)

❑ কুরবানির পশুর পুরো চামড়াটাই হাদিয়া করে দেওয়া যেতে পারে। তবে বিক্রি করলে তার মূল্য গরিবকে দান করা জরুরি। বিক্রয়লব্ধ চামড়ার মূল্যটা হুবহু ঐভাবেই প্রাপ্যদের হাতে পৌঁছে

দেওয়া উচিত। টাকাটা কোনো কাজে খরচ করে পরবর্তীতে সমপরিমাণ টাকা নিজের থেকে পরিশোধ করাটা নিতান্ত দোষণীয় হলেও আদায় হয়ে যাবে। (ফাতাওয়া শামী, ৬/৩২৮; আলমগীরী, ৪/১০৬)

❑ কুরবানির গোশত, চামড়া বা তার মূল্য দ্বারা কসাই, জবেহকারী বা অন্য কারো পারিশ্রমিক দেওয়া নাজায়িয। পৃথকভাবে তাদের মজুরি দিতে হবে। কুরবানিদাতার পক্ষে চামড়া দ্বারা বালতি, মশক, জায়নামাজ প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করে ব্যবহার করা বৈধ আছে। (শামী, ৬/৩২৮)

মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানি

❑ মৃত ব্যক্তিকে সওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে তার পক্ষ থেকে কুরবানি করা যায়। আর সে কুরবানির গোশত সকলেই খেতে পারে। কিন্তু মৃত ব্যক্তি যদি তার নিজস্ব মাল থেকে কুরবানি করার ওসিয়ত করে যায়, তাহলে কুরবানির সম্পূর্ণ গোশত সদকা করে দিতে হবে। (শামী, ৬/৩৩৫)

❑ একাধিক লোক মিলে এক মৃত ব্যক্তির জন্য কুরবানি করতে পারে। যেমন– ছয় ব্যক্তি কুরবানির উদ্দেশ্যে একটা গরু খরিদ করল। তাতে ছয় জনের ছয় অংশ থাকল, অবশিষ্ট একাংশ তাদের সকলের ঐক্যমতে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা যে কোনো মৃত ব্যক্তির জন্য দেওয়া হলো। (বাদায়িউস সানায়ি'; ফাতাওয়া রহীমিয়া)

❑ কারো ওপর কুরবানি ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও যদি সে নিজের পক্ষ থেকে কুরবানি না করে কোনো মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে নফল কুরবানি করে, তাহলে ঐ কুরবানির দ্বারা তার নিজের ওয়াজিব কুরবানি আদায় হবে না। বরং তার ওপর আর একটি কুরবানি করা ওয়াজিব হবে। কারণ, একটি কুরবানি দুইজনের পক্ষ থেকে যথেষ্ট নয়। আর যদি কুরবানি নিজের পক্ষ থেকে করে এবং মৃত ব্যক্তির জন্য ঈছালে সাওয়াব উদ্দেশ্য হয়, তাহলে উক্ত কুরবানির দ্বারাই তার ওয়াজিব আদায় হবে। (ফাতাওয়া মাহমূদিয়া, ৮/২১৮; ফাতাওয়া আলমগীরী, ৫/৪২০)

কুরবানির গোশতের হুকুম

❑ কুরবানির গোশত সবাই খেতে পারে। নিজে খাবে, আত্মীয়স্বজনকে দিবে এবং গরিব-মিসকিনদের মাঝে বণ্টন করবে। যদি সম্পূর্ণ গোশত নিজে খায়, তবুও নাজায়িয হবে না। তবে উত্তম এই যে, কুরবানির গোশতকে তিন ভাগ করবে। এক ভাগ স্বয়ং নিজের ও পরিবার-পরিজনদের জন্য রাখবে, এক ভাগ আত্মীয়স্বজনকে এবং এক ভাগ ফকির-মিসকিনদের মধ্যে বিলিয়ে দিবে। অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ ফকির-মিসকিনদেরকে দেওয়া মুস্তাহাব। তবে কেউ যদি সম্পূর্ণ গোশত নিজেই খায়, দান না করে তাও জায়িয আছে। (হিদায়া ৪/৫; ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ,১৪/৩৩৫; দুররে মুখতার, ৬/৩২৮; আলমগীরী, ৫/৩০০)

❑ কুরবানির গোশত বাসাবাড়ির চাকর-চাকরানিকে বেতন হিসেবে খাওয়ানো জায়িয হবে না। বেতন হিসেবে না দিয়ে যদি এমনিতেই দেয়, তাহলে কোনো অসুবিধা হবে না।

❑ কুরবানির গোশত অমুসলিমকেও দেওয়া যেতে পারে। (আযীযুল ফাতাওয়া ৭৬১)

❑ কারো ওপর কুরবানি ওয়াজিব ছিল, কিন্তু সে তিনদিনের মধ্যে কুরবানি করেনি, তাহলে তার ওপর একটি ছাগল বা ভেড়া অথবা একটি হালাল বড়ো জন্তু এক-সপ্তমাংশের মূল্য সদকা করা ওয়াজিব।

❑ কুরবানির পশু জবেহ করে তার বিনিময় গ্রহণ করা জায়িয আছে। বরং বিনিময় নেওয়াটা জবেহকারীর হক। তবে সেই বিনিময় কুরবানির গোশত বা চামড়ার দ্বারা লেনদেন করা নিষেধ। অবশ্য কেউ যদি আল্লাহর ওয়াস্তে অন্যের জন্তু জবেহ করে দেয় তাহলে তার জন্য উত্তম। তবে কেউ যদি কোনো দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের গরিব-মিসকিনদের জন্য প্রতিষ্ঠানের খরচে চামড়া কালেকশনের জন্য প্রেরিত হয়, তাহলে তার জন্য জবেহ করার বিনিময়ে কেউ দিলে, তা নিজে না নিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানে জমা দেওয়া উচিত। (আযীযুল ফাতাওয়া ১/৬৬৯' কিফায়াতুল মুফতী ৮/২৪৫)

❑ হালাল প্রাণীর আটটি অংশ খাওয়া নিষেধ। যথা- ১. পুরুষ লিঙ্গ, ২. স্ত্রী লিঙ্গ, ৩. মূত্র থলি, ৪. পিঠের হাড়ের ভেতরের মগজ বা সাদা রগ, ৫. চামড়ার নিচের টিউমারের মতো উঁচু গোশত, ৬. অণ্ডকোষ, ৭. পিত্ত এবং ৮. প্রবাহিত রক্ত।

উল্লেখ যে, শুধু প্রবাহিত রক্ত খাওয়া হারাম, আর অবশিষ্টগুলো মাকরূহে তাহরীমী। (ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/১১; ফাতাওয়া রহীমিয়া ২/২২৩; আল-বাহরুও রায়িক ৮/৪৮৫)

লেখক: পরিচালক, দারুল ইফতা ওয়াল ইরশাদ

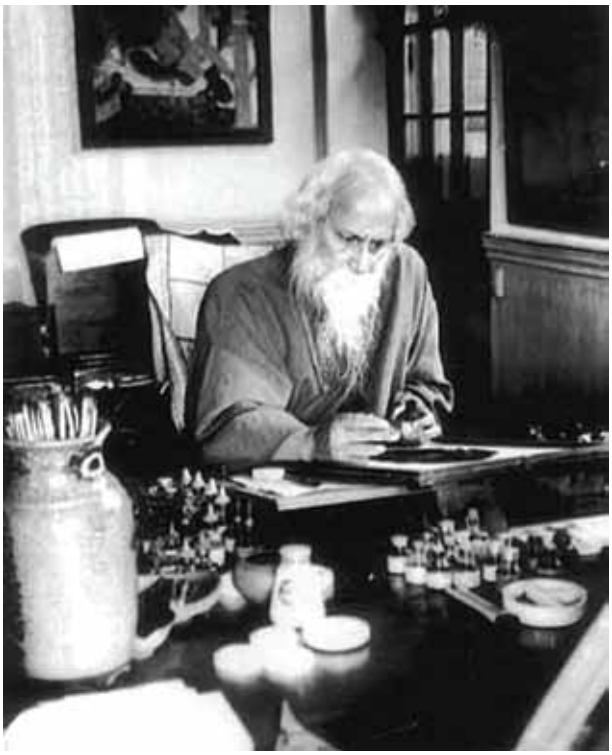

কবিগুরুর ৭৭তম মৃত্যুবার্ষিকী

রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প

ম. মীজানুর রহমান

শতাব্দীক্রমের বাংলা গদ্য ও পদ্য সাহিত্যের বিশাল অঙ্গনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) আধুনিক শিল্প নৈপুণ্যের বৈচিত্র্যের কথা বলে শেষ করা যাবে না। কিন্তু তাঁর জীবনের শেষার্ধে চিত্রশিল্পের যে পরিচয়টুকু আমরা পেয়েছি তাও জাত চিত্রশিল্পী থেকে কম নয়। তাঁর শিল্পকর্মের আলো-আঁধারের ঝরনাধারায় চিত্রকল্প এবং ভাব-প্রতীকীর যে অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে তা আজও অতুল্য বললে অত্যুক্তি হয় না। সবার উপরে মানব-মানবীর জীবন চরিত্রের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আনন্দ-বেদনা, নৈরাশ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার সবই যেন ভাস্বর হয়ে ফুটে উঠেছে তাঁর চিত্রের রেখায় রেখায়। তাই তাঁর শিল্পকর্মের অন্তর্গত ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্য সমগ্র বিশ্বের বিদগ্ধজনের দৃষ্টি কেড়ে নিতে সমর্থ হয়েছে। যেন আপনার মনের মাধুরী মিশিয়ে তিনি গীতি ছন্দে এঁকে গেছেন তাঁর প্রতিটি স্কেচ। এ সবই যেন তাঁর গদ্য ও পদ্য কবিতার মতো স্রোতস্বিনীর ধারায় প্রবহমান বলে মনে হয়।

জীবন ও প্রকৃতির যে আবিশ্ব কর্মধারার চিত্র তা কখনোই দেখে দেখে শেষ করা সম্ভব নয়। তবু কবির অন্তর্গত চেতনার আশ্চর্য স্পর্শে তা যেন হয়ে গেছে চির জাগ্রত আর এখানেই তাঁর শিল্পকর্মের সার্থকতা সাত্ত্বিক।

রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য ধারায় যেমন গান রচনা করেছেন এবং গানের নোটেশন দিয়েছেন তেমনি চিত্রাঙ্কনেও পাশ্চাত্য ধারা অবলম্বন করেছেন ব্যাপকভাবে। জীবনের শেষ বিশ বছর তিনি বিশেষত স্কেচধর্মী চিত্রকর্মেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আর এরমধ্যেও ছিল তাঁর কাব্যিকতার মাধুর্য।

'রবীন্দ্র চিত্রকলায় অরূপের অন্বেষা' নিবন্ধে পূর্ণেন্দু শেখর পত্রী যথার্থই উল্লেখ করেছেন যে, 'তাঁর শেষ কুড়ি বৎসরের সাহিত্য ও তাঁর মনের গতি বোঝবার জন্য তাঁর ছবির বিশেষ মূল্য আছে; আমাদের মনে হয় কবি রবীন্দ্রনাথকে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ একটা নূতন পথে নিয়ে গিয়েছিলেন। চিত্র রচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটা নূতন জগৎ আবিষ্কার করেছিলেন, যে জগতের সত্তার বিষয় ইতিপূর্বে তিনি হয়তো এমন তীব্রভাবে অনুভব করেননি, ছবি আঁকতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করলেন ওয়ার্লড অব গেস্‌চার, যার কাছে রবীন্দ্রনাথের মতে ওয়ার্লড অব মিনিং সামান্য।... কাব্যের প্রাচীন পটভূমি থেকে আসছে ছবি। ছবির জগৎ থেকে রেখার ভঙ্গি গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে কবিতার জগতে– কবিতাকে করে তুলছে নিরাভরণ, অলংকার ভারমুক্ত। আবার কবিতার জগতে বিশ্বপ্রকৃতির রূপ-রস-সৌন্দর্যকে নিংড়ে নিয়ে ছবির জগতে তাকেই প্রকাশ করছেন অসুন্দরের প্রতি নতুন-জাগা অন্তরঙ্গ সখ্যতায়। অসুন্দরকে, বিসদৃশকে তাদের যথার্থরূপে ও রেখায় প্রকাশ করার তীব্র ও বেপরোয়া ব্যাকুলতাই রবীন্দ্র চিত্রকলার সার্থকতা। তাই নিঃশঙ্কচিত্তে একথা তিনি বলতে পেরেছিলেন– 'আমার ছবি যখন বেশ সুন্দর হয়, মানে সবাই যখন বলে, 'বেশ সুন্দর হয়েছে', তখন আমি তা নষ্ট করে দিই, খানিকটা কালি ঢেলে দিই বা এলোমেলো আঁচড় কাটি। যখন ছবিটা নষ্ট হয়ে যায়, তখন তাকে আবার উদ্ধার করি'।

বলা বাহুল্য, শুরুতে (তাঁর) সংকোচ ছিল প্রচুর। বারে বারে দ্বিধা প্রকাশ পেয়েছে নানাভাবে– 'আমি কি আর ছবি আঁকি, শুধু আঁচড়-মাচড় কাটি। নন্দলাল তো আমাকে শেখালে না; কত বল্লুম'। প্যারিসের প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি বিপুল সংবর্ধনা পাওয়ার পরও, এমনকি পল ভ্যালেরি ও আঁদ্রে জিদ-এর মতো কলারসিকদের দুর্লভ প্রশংসায় নিজের ছবিকে বিশ্বের 'আগামী যুগের আর্ট' জানবার পরেও একেবারে নিঃসংশয় হতে পারেননি।

'রবীন্দ্রনাথের ছবি'– যামিনি রায় লিখেছেন,

'রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে কিন্তু ভারি একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। তাঁর শিল্প ইতিহাসের মধ্যবর্তী স্তরগুলি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই। এক্ষেত্রে পতন প্রায় অনিবার্য হয় কিন্তু সবচেয়ে বড়ো বিস্ময় তা হলো না। তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি দেখে বোঝার উপায় নেই যে তিনি এদিকে নব আগন্তুক মাত্র। তাঁর এই অভিজ্ঞতার অভাব ঢাকা পড়ার একমাত্র ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাই তাঁর কল্পনার অসামান্য ছন্দোময় শক্তিতে। রেখার কথা, রঙের কথা সবই তিনি আয়ত্ত করেছেন এই কল্পনার শক্তিতেই; অনভিজ্ঞতার ত্রুটি খুঁজতে যাওয়া সেখানে বিড়ম্বনামাত্র। তাই বলে কল্পনার প্রাবল্য সব সময়ে সমান সজাগ থাকে না এবং এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কখনো কখনো হয়তো তাঁর অনভিজ্ঞতা মাথা তুলতে পেরেছে। যেমন ধরুন, তাঁর 'খাপছাড়া'র কয়েকটি ছবিতে সমস্তটা একভাবে আঁকার পর নাক ও চোখের বেলায় টান দিতে গিয়ে তিনি সাধারণ রিয়ালিস্টিক আঁচড় দিয়ে বসলেন। অবশ্য কোনো শিল্পীর আলোচনায় তাঁর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নিয়েই আলোচনা করা উচিত। এবং রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলিতে বলিষ্ঠ কল্পনার পাহারায় অনভিজ্ঞতা কাছে ঘেঁষতে পারেনি।...

রবীন্দ্রনাথের ছবিকে শ্রদ্ধা করি তার শক্তির জন্য, ছন্দের জন্য, তারমধ্যে যে বৃহৎ রূপবোধের আভাস পাই তার জন্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত একজন বিশ্ববিশ্রুত নোবেল বিজয়ী কবি কিন্তু তাঁর প্রতিভার আশ্চর্য এবং অনবদ্য স্ফুরণ ঘটেছে তাঁর চিত্রাঙ্কনে, যা বিস্ময়কর না বললেই নয়।

লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক ও গবেষক

নিবন্ধ

জাতীয় কবির ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী

জাতীয় কবির নজরুলগীতি

আতিক আজিজ

বাংলা ভাষার অনেক কবিই একাধারে সুরস্রষ্টা ও সংগীতজ্ঞ। এটি হয়ত বাংলার মাটির বৈশিষ্ট্য। উদাহরণস্বরূপ, রামপ্রসাদ, নিধু বাবু, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, রবীন্দ্রনাথ, অতুল প্রসাদ ও কাজী নজরুল ইসলামের নাম করা যেতে পারে।

বিদ্রোহী কাজী নজরুল ইসলাম বিবিধ বিষয়ে সংগীত রচনায় যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, আর তাতে সুর যোজনায় যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন, তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। জাতীয় সংগীত, ঠুংরি, হাসির গান, গজল, ধ্রুপদ, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, টপ্পা, খেয়াল, ইসলামি সংগীত, মর্সিয়া, ভাওয়াইয়া প্রভৃতি যে দিকে হাত দিয়েছেন, সেই দিকেই অপূর্ব সফলতা অর্জন করেছেন।

একই ব্যক্তি কেমন করে কীর্তন আর ইসলামি সংগীতে সমান পারদর্শিতা দেখাতে পারেন, তা স্মরণ করে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এর কারণ আর কিছু নয়, শুধু এই যে, তিনি কবিসুলভ সহানুভূতিতে হিন্দু-মুসলিম-নির্বিশেষে জনমনের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছিলেন বলেই তাদের অব্যক্ত মনোভাব পরিপূর্ণরূপে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। বিশেষ করে নিজের মরমি সাধনা আর জন-সংস্পর্শের ফলে, দেশে ধর্মীয়ভাব, তার আদর্শ ও উন্মাদনা মর্মগ্রাহীভাবে সুসংগীত মধুর বাণীতে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন।

শুধু গানের সংখ্যার দিক দিয়ে দেখতে গেলে অবশ্যই রবীন্দ্রনাথকে প্রথম স্থান দিতে হয়; কিন্তু তাঁর অনেক গানই প্রথমে কবিতা হিসেবেই রচিত হয়, পরে সেগুলো অন্যের দ্বারা বা তাঁর নিজের দ্বারাই সুরে গাঁথা হয়। রবীন্দ্রনাথের সেই সব গান বাণী-প্রধান, অর্থাৎ সুরের চেয়ে ভাবের আকর্ষণই তাতে বেশি প্রবল। কাজী নজরুল ইসলামের ক্ষেত্রে প্রথমে তাঁর মনে সুর আসতো, তারপর সুরানগত বিষয় এবং বাণীর 'আবির্ভাব' হতো (এ ক্রিয়াটি এত শীঘ্র ঘটত যে, তাকে 'আবির্ভাব' না বলে উপায় নেই।) কাজেই, গানের প্রকৃতি অনুসারে, তাল-লয়গত ছেদ বা যতি দিয়ে না পড়লে (অর্থাৎ পদ্য আবৃত্তির মতো পড়ে গেলে) অনেক স্থলে একটু খাপছাড়া বলে বোধ হয়। প্রকৃতপক্ষে গান তো কবিতা নয়। সুতরাং এই-ই হওয়া উচিত। নজরুলকে এক সময়ে গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে অনেক রেকড-সংগীত লিখতে হয়েছে। এগুলোকে কবিতা হিসেবে দেখতে যেয়ে অনেক সাহিত্যিক বলে থাকেন যে, নজরুল অনেক ক্ষেত্রে তাঁর কবিধর্ম বিসর্জন দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সংগীতকে বা সংগীতের বাণীকে কবিতা হিসেবে দেখতে যাওয়াই ভুল। নিতান্ত জীবিকার প্রয়োজনে লিখিত গানেও তিনি গায়ক-ধর্ম ভুলেননি, বরং সঙ্গে সঙ্গে তাকে কাব্য-সৌন্দর্যেও মণ্ডিত করেছেন। অবশ্য, নজরুলগীতিতে বাণী-প্রধান গানও অনেক আছে! তাতে রবীন্দ্র-প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়। ভাবের গভীরতা আর প্রবলতা দুটো আলাদা জিনিস। আমার মনে হয়, মোটের ওপর গভীরতার দিক দিয়ে নজরুলগীতি (বা সংগীত) উৎকৃষ্টতর হলেও কাব্যের প্রবলতার দিক দিয়ে নজরুলগীতি নিঃসন্দেহেই শ্রেষ্ঠ। রবীন্দ্রসংগীতে ভগবৎ-প্রেম, মানবীয় প্রেম আর ঋতুসংগীত ও ক্রিয়া সংগীতের প্রাধান্য। এসবের ভেতর দিয়ে একটা বিশিষ্ট ঢং গড়ে উঠেছে, যাকে 'রবীন্দ্রসংগীত' নাম দেওয়া হয়েছে। নজরুলগীতিরও একটা সাধারণ ঢং আছে; কিন্তু তার বৈচিত্র্য এত অধিক যে, সবগুলোকে একটা নিজস্ব 'নজরুলী ঢং' বলা বোধ হয় সংগত হয় না। তবু সংগীত প্রতিযোগিতাতে রবীন্দ্রসংগীতের মতো 'নজরুলগীতি' বলে আর একটা শ্রেণির রেওয়াজ গড়ে উঠেছে।

কালক্রমে 'নজরুলসংগীত'-এরও একটা বিশিষ্ট রূপ গড়ে উঠতে পারে। তবু মনে হয়, উপরে নজরুলসংগীতের যেসব শ্রেণি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোই নজরুলগীতি পরিচয়ের জন্য বিশেষ প্রশস্ত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রেকর্ড-সংগীতের অজস্রতা আর দেশি ও বিদেশি মার্গ ও লৌকিক প্রভৃতি বিবিধ সুর সৃষ্টির সংখ্যা-বৈচিত্র্য নজরুল ইসলাম পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে রয়েছেন।

গজল গান স্বভাবতই দীর্ঘায়িত এবং একঘেয়ে ধরনের। এই একঘেয়েমি দূর করার জন্য তিনি বাংলা গানে উর্দু সুরের মতো আবৃত্তিযোগ্য পদ সংযোজন করে এর বৈচিত্র্য বিধান করেছেন। খেয়াল ধ্রুপদ গানে রীতিমতো গাম্ভীর্য আর ভাব সংগীত বজায় রেখেছেন। এইগুলোর মধ্যে ওস্তাদের কাছে শিক্ষার ফল প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ করা যায়। ঠুংরি ও টপ্পা গানেই নজরুলের বিশেষত্ব বেশি করে ফুটে উঠেছে। সুরের বৈচিত্র্য ও আকস্মিক পরিবর্তন তো আছেই, সঙ্গে সঙ্গে ভাবের এমন তীক্ষ্ণ ঝলক অন্যত্র কমই দেখা যায়। দুটো উদাহরণ উল্লেখ করা হলো:

(ক) কারে মন দিলি কবি,
এ যে রে পাষাণ ছবি,
এ শুধু রূপের রবি নিশীথের স্বপনে।

(খ) কাজল করি তারে রাখি গো আঁখি-পাতে
স্বপনে যায় সে ধুয়ে গোপন অশ্রু সাথে।
বুকে তায় মালা করি রাখিলে যায় সে চুরি
বাঁধিলে বলয় সনে মলয়ায় যায় সে উড়ি।
কি দিয়ে সে উদাসীর মন মোহি?

(গ) বুকে তোর সাত সাগরের জল, পিপাসা মিটল না কবি,
ফটিক জল খুঁজিস যেথায় কেবলি তড়িৎ ঝলকে।

এখানে মানবীয় প্রেমের মধুর ব্যর্থতা আর উদ্দামতা নিরাভরণ সারল্যের সাথে বর্ণিত হয়েছে। ভদ্রতার কৃত্রিমতা মনকে পরিতৃপ্ত করতে পারে, কিন্তু অকুণ্ঠ প্রবলতা হয়ত হৃদয়বৃত্তির কাছে আরো ঘনিষ্ঠ বলে মনে হবে।

বাংলা সাহিত্যে এ পর্যন্ত যত কীর্তন রচিত হয়েছে, তার মধ্যে নজরুল-রচিত কয়েকটি কীর্তন যে কাব্যাংশে শীর্ষস্থান অধিকার করে রয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ইসলামি সংগীতের ক্ষেত্রে হাম্‌দ, নাত, মর্সিয়া ইত্যাদি কবিতা সাধারণ মুসলমান সমাজের মনোবৃত্তিরই রূপায়ণ। এর কথা সরল, ভক্তি-প্রধান এবং সচরাচর প্রচলিত উর্দু গজলের সমপর্যায়ভুক্ত কাব্যাংশে অনেক ক্ষেত্রেই ম্লান। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন পদ রয়েছে যা সমুদয় মুসলিম জগতে তুলনাহীন। 'আমিনা মায়ের কোলে' আবির্ভূত হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর গুণাবলির মধ্যে রয়েছে- 'ব্যথিত মানবের ধ্যানের ছবি'। এ রকম চরণ শেখ সাদী, হালী বা ইকবালের কবিতায় বা সংগীতে কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। নজরুলের ইসলামি গানের সংখ্যাও প্রায় দুইশয়ের কাছাকাছি হবে। সামাজিক ব্যঙ্গবিদ্রুপ তো আছেই, তাছাড়া নিছক হাস্য-রসের গানও অনেক রয়েছে।

নজরুলের গলায় সুরের যে ব্যঞ্জনা আর ভাবাশ্রায়িতা প্রকাশ পেত তার গুণে তাঁর গানের আসর জমজমাট হয়ে উঠত, সে পরিবেশে সকলের মনেই সাড়া জেগে উঠত। তাঁর গানের রেকর্ডের গায়ক হচ্ছেন কৃষ্ণচন্দ্র দে, ইন্দুবালা, আব্বাসউদ্দীন প্রমুখ বিখ্যাত শিল্পীবৃন্দ। কিন্তু প্রায় সব গানেরই সুর নজরুলের নিজের দেওয়া। তাঁর রেকর্ড-সংগীতের অনেক মহড়াতে তাঁর সুরের তীক্ষ্ণ অনুভূতির উপস্থিতি লক্ষণীয়। তাঁর মনে প্রত্যেক গানের সুরের একটা রূপ বিরাজ করত; শিল্পীদের সুর বিস্তারে সামান্য একটু ভাব-রূপের ব্যতিক্রম হলেই, মানানসই সুর বাতলে দিতেন। এখানে সহজেই প্রশ্ন উঠতে পারে, কাজী নজরুল ইসলাম কি একজন মস্তবড়ো ওস্তাদ ছিলেন? এর জবাব এই যে , তিনি এক সময়ে মুর্শিদাবাদের ওস্তাদ মঞ্জু সাহেবের কাছে বেশ কিছুদিন আনুষ্ঠানিকভাবে মার্গ-সংগীত সাধনা করেছিলেন; তা ছাড়াও কলকাতা, ঢাকা, কুমিল্লা প্রভৃতি বহু অঞ্চলের ওস্তাদের কাছ থেকে শুনে কিছু কিছু শিখেছিলেন বটে; কিন্তু যাকে 'ওস্তাদ' বলে, তিনি তা ছিলেন না। তবে কবি-প্রকৃতির গুণে সুর তাঁর মনের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বসে গিয়েছিল। এক সময়ে তিনি এই উক্তি করেছিলেন:

'ওস্তাদেরা কেউ গানের বিএ. কেউবা এমএ পাস। আমি হয়ত ম্যাট্রিক পাস হলেও হতে পারি; কিন্তু এমন কতকগুলো জিনিস জানি যা এমএ. পাস বা ডক্টর উপাধিধারীর যোগ্য'।

এ জিনিসটা বোধ হয় তার স্বাভাবিক সুর-সংগীতবোধ। নজরুলের জাতীয় সংগীতগুলো এত বিখ্যাত যে, সে সম্বন্ধে কিছু না বললেও চলে। এর ভেতর দিয়ে দৃঢ় সংকল্প আর জাগরণীর বাণী ধ্বনিত হয়েছে, সুরের ভেতর দিয়ে যুদ্ধের পদক্ষেপ আর কাড়া-নাকাড়ার ধ্বনি শোনা যায়।

গানের ভাষায় উর্দু-ফারসির সুসংগত মিশ্রণ এবং সুরে বিশিষ্ট ঝোঁকের প্রবর্তন করে নজরুল বাংলা সাহিত্য আর সংগীতের সুর-বিন্যাস দুই দিক দিয়েই শ্রীবৃদ্ধি করেছেন। এছাড়া আরবি, তুর্কি এবং ইরানি, মিসরীয় প্রভৃতি বিদেশি সুরে অন্তত পাঁচ-ছয়টা নতুন রাগ সৃষ্টি করে নিজের সংগীত রসজ্ঞতার আর এক প্রমাণ দিয়েছেন।

লেখক: কবি ও সাহিত্যিক

সংগ্রাম-যুদ্ধের অবিসংবাদিত নেতা

কাজী রোজী

সেদিনও এমনি ছিল বসন্ত দিন। দারুণ চৈত্র মাস।
১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ। টুঙ্গিপাড়ায় রাত আটটায়
সম্ভ্রান্ত শেখ পরিবারে একটি শিশুর জন্ম-চিৎকারে
আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠেছিল মহানায়কের মতো।
গোপালগঞ্জের মানুষ জানে,
সেদিনের বন-প্রকৃতি কেমন ছিল, কতটা ছিল রাতের গভীরতা।
মধুমতির জল-রং-ঢেউ জানে,
দামাল কিশোর সেই খোকাটির সাঁতার কাটার দিনগুলো।
জানে বাংলার মানুষ সকল
পথে-প্রান্তরে আন্দোলনের সংকটময় দিনগুলো
সংগ্রাম-যুদ্ধের অবিসংবাদিত নেতা হয়ে ওঠার দিনগুলো
স্বপ্ন চোখের সোনার বাংলার ইতিহাস গড়ার দিনগুলো।
কিন্তু তবু পথ ফুরোতে অনেক ছিল বাকি।
ততটা সময় ধরে অনেক রাত্রি-দিনের শানবাঁধানো ঘাটে
জলের সাথে গল্প-কথার বিস্তর আয়োজনে হতে পারত।
প্রগতি দারুণ চলার পথে অনেক ডিজিটাল বাঁধনের
শক্ত সেতু তৈরি হতে পারত, হতে পারত
অনেক অনাচার-অবিচার ঘেরা দিকচিহ্ন বলয়ের শেষ।
হতে পারত মানুষে মানুষে সখ্য গড়ার দুর্বার অমলিন ইতিহাস।
হে বঙ্গবন্ধু, মধ্যপথের যাত্রী তুমি ছিলে। কেবল চলছিলে।
সেই কালরাতেও বিশ্বাস করেছিলে 'তোমার শত্রুও তোমাকে মারতে পারবে না'
বুলেটে ছিল না ভয় সাহসে ছিল না ক্ষয়
বুকের পাঁজর থেকে ফিনকির মতো রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে তৈরি হলো
পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্টের কলঙ্কিত সকাল। অগ্নিসাক্ষী হয়ে প্রাণ দিল গোটা পরিবার।
হে জাতির পিতা, মানুষের প্রয়োজনে রাজপথ ধরে ধরে
এসেছিল একাত্তর। মার্চের সাত। রেসকোর্সের ময়দান।
স্বাধীনতার ডাক। লক্ষ লক্ষ শহিদের আত্মার বিনিময়ে,
নারী মুক্তিযোদ্ধার সম্ভ্রম হারানোর বিনিময়ে,
অর্জিত হলো বিজয়ের গৌরব ১৬ই ডিসেম্বর।
এ মাটির ধূলিকণা যার হাতে হয়েছিল সোনা
যার ডাকে এসেছিল একাত্তরে স্বাধীনতা যুদ্ধের দিন
তাঁর কাছে বাঙালির কত ঋণ এদেশের মানুষের
কত ঋণ বলে বলে শেষ করা যায় না
সবুজ ঘাসের ঋণ, সূর্য লালের ঋণ, যুদ্ধের ঋণ।
সবটা সীমানা জুড়ে জাতীয় পতাকাতলে আমরা সবাই
হৃদয়ে বিছিয়ে রাখবো তাঁর দূরদৃষ্টির চোখগুলোতে।
তাঁর দুটি চোখ
হাসিনা ও রেহানার মুখ
তাঁর সেই বুক
বাংলার সারাটা আকাশ।
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ইচ্ছেগুলোর প্রতি হাজার হাজার
লক্ষ কোটি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।

তোমার মৃত্যু নেই

সোহরাব পাশা

মহানায়ক তুমি বাংলা ও বাঙালির
এনেছ স্বাধীনতার মুক্তির সনদ
স্বপ্নময় উজ্জ্বল পতাকার দৃপ্ত অহংকার
অপ্রতিরোধ্য ছিল তোমার ক্ষিপ্র শাণিত সাহস
ছিন্ন করে দিতে সব কুটিল ষড়যন্ত্রের জাল
তোমার বজ্রকণ্ঠের উত্তাল তরঙ্গে
জনসমুদ্রের সেই মহাজাগরণ
ধারণ করতে পারেনি মহা কল্লোলের
ওই বঙ্গোপসাগর,
কে বলে পনেরো আগস্ট মানেই তুমি কোথাও নেই
তোমার মৃত্যু নেই, চির অমর তুমি বঙ্গবন্ধু
তুমি আছ এবং থাকবে চিরঞ্জীব
মহাকালের অম্লান–উজ্জ্বল পাতায়
এই বিশ্বের সকল মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে।

মৃত্যুহীন এক প্রাণ

শাফিকুর রাহী

ত্রিশ লক্ষ শহিদের সাথে ঘুমিয়ে আছ তুমি,
তোমার রক্তে উঠবে জেগে পবিত্র এ ভূমি।
কালের পরে মহাকাল তুমি স্বদেশের বন্দরে,
বর্গী তাড়াতে জোগাবে সাহস বাঙালির অন্তরে।
কে বলে তোমার মৃত্যু হয়েছে; কারা বলে তুমি নেই;
কোটি মানুষের চোখের তারায় জ্বলেছ অন্তরেই।
তুমি তো বন্ধু চিরকাল আছ প্রকৃতির সম্ভারে,
আলোর সারথি- বাইছ কিন্তি গভীর অন্ধকারে!
যতদিন এই আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য-তারা,
দশদিগন্তে ছড়াবে আলোক, হয়েই আত্মহারা।
কে বলে তোমার মৃত্যু হয়েছে, কারা বলে পিতা নেই!
তুমি তো নিত্য জাগ্রত প্রাণ জনতার সংগ্রামেই।
বিশ্ববাসীর মাঝেই তুমি তো গর্বিত গরিমায়,
বীরত্বেরই শক্তি সাহস জোগাবে স্বপ্ন নায়।
তোমার সকল গর্ব-কাহিনি কালের ইতিহাসে,
বীর তারুণ্যের জাগরণে আজ জাতির পিতা হাসে।
কে বলে তোমার মৃত্যু হয়েছে; কে বলে বন্ধু নেই;
তোমার বজ্রকণ্ঠ বাজে অনন্ত উদ্দামেই!
দীর্ঘজনম পর হলেও বাঙালির জয়গান,
কোটি জনতার কণ্ঠে বাজে মৃত্যুহীন এক প্রাণ।
আকাশ-বাতাস-মাটি ও মানুষ, বঙ্গবন্ধুর নামে,
লিখছে পত্র, উড়ো চিঠি যেন নীল বেদনার খামে।
কে বলে তোমার মৃত্যু হয়েছে; জাতির পিতা যে নেই;
তোমার নামেই গর্জে ওঠে দুঃসহ সংগ্রামেই।
আবার তোমার সাহসী বাঙালি গর্জন প্রতিবাদে,
মহা বীরত্বের বীর মহিমায় ভালোবেসে আজও জাগে।
মেঘলা আকাশে আলোর পাখনা দৃপ্ত শপথ পাঠে,
বীর তারুণ্যের জাগল জোয়ার, শাহবাগের মাঠে।
কে বলে তোমার মৃত্যু হয়েছে মানব কেমন করেই;
ডিজিটালের ব্লগার যোদ্ধা সারারাত ধরে জেগেই।
তোমার মহৎ বীর গরিমায় আনন্দ উদ্যানে,
আলোকিত এক আগামী দিনের সম্ভাবনার গানে
দারুণ স্বপ্নে বৃক্ষ শাখাতে বাবুই-দোয়েল নাচে,
সাহসী জাতির পরম আপন বন্ধু কে আর আছে!
কে বলে তোমার মৃত্যু হয়েছে; কারা বলে তুমি নেই;
চোখের তারায় ছবিটি ভেসে ওঠে যে তাকালেই।

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০১৮

মায়ের দুধ পান: সুস্থ জীবনের বুনিয়াদ

সুলতানা বেগম

জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মাতৃদুগ্ধ পান করানোর ব্যাপারে সচেতনতার লক্ষ্যে 'মায়ের দুধ পান: সুস্থ জীবনের বুনিয়াদ' প্রতিপাদ্য নিয়ে ১লা আগস্ট থেকে ৭ই আগস্ট পর্যন্ত পালন করা হয় 'বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০১৮'। নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করা হয় দিবসটি। মহান আল্লাহ তায়ালা যখন মানুষকে পৃথিবীতে পাঠান তখন সে থাকে শিশু। অবুঝ থাকে, থাকে না কোনো কিছু করার ক্ষমতা। মায়ের বুকের দুধই একমাত্র অবলম্বন, প্রথম ও প্রধান খাদ্য। যা শিশুকে দুনিয়াতে প্রেরণের সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালা মায়ের স্তনে পাঠান। শিশু জন্মের পর প্রথম যে দুধ পান করে তা হচ্ছে 'শালদুধ'। চিকিৎসকদের মতে, এ শালদুধ শিশুর প্রথম ভ্যাকসিন। এতে যে প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান পুষ্টিকর উপাদান রয়েছে তা শিশুকে নানাপ্রকার রোগব্যাধী থেকে রক্ষা করে। এতে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে আমিষ, শর্করা, স্নেহজাতীয় পদার্থ, খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন। এ দুধ শিশুকে অন্ধত্বের হাত থেকে রক্ষা করে। শিশুর জীবনীশক্তি, বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ ঘটে। যে-কোনো প্রদাহ বা ইনফেকশন থেকে রক্ষা করে। চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি পায়। ডায়রিয়াজনিত পানিশূন্যতা, বিকলাঙ্গতা ও শ্বাসকষ্ট প্রতিরোধ করে এবং মৃত্যুর হার কমায়। গবেষণায় দেখা গেছে, শিশুর বয়স বাড়ার সাথে সাথে শরীরের চাহিদা অনুযায়ী মাতৃদুগ্ধের ধরন এবং পুষ্টিগুণও পরিবর্তন হতে থাকে। মাতৃদুগ্ধ শিশুর কাছে শুধু পানীয় খাদ্য নয়, প্রথম অবলম্বন, নিরাপত্তার প্রথম নিশ্চয়তা এবং বিশ্বসংসারের সাথে যোগসূত্র ঘটায়। এছাড়া যুদ্ধবিগ্রহ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগেও মাতৃদুগ্ধ শিশুর নিরাপদ খাদ্য। এটি আল্লাহ প্রদত্ত। তাই অর্থের কোনো প্রয়োজন হয় না। আচার-ব্যবহার, সামাজিকতা ও মানুষের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এমনকি মাতৃদুগ্ধ পানে মা ও শিশুর মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক ও চিরস্থায়ী আত্মার বন্ধন তৈরি হয়। এজন্য শিশুর জন্মের পর থেকে ২ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অন্যান্য খাবারের সাথে বুকের দুধ দিতে হবে। তাহলে শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত ও ত্বরান্বিত হবে।

ইসলামে মাতৃদুগ্ধ পানের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো ওয়াজিব করে দিয়েছেন। জন্মের পর থেকে শিশুকে মায়ের দুধ পান করানোর সময়সীমা সম্পর্কে সূরা বাকারার ২৩৩ নং আয়াতে সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন- 'জননীগণ পুরো ২ বছর সন্তানদের বুকের দুধ দেবে, যদি তারা মায়ের দুধ খাওয়ানোর সময় পূর্ণ করতে চায়'। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, গরুর দুধেও মানবদেহের প্রয়োজনীয় কেজিন বা ল্যাক্টোজ থাকে, যা অন্য কোনো খাদ্যে থাকে না। কিন্তু কৃত্রিম গুঁড়া দুধ মোটেই কল্যাণকর নয়। গুঁড়া দুধে থাকে ক্ষতিকর মেলামাইন ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ, যা শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য গুঁড়া দুধ পান করা শিশু প্রায়ই অসুস্থ থাকে এবং তাদের মৃত্যু হার সবচেয়ে বেশি। তাই গুঁড়া দুধ পান থেকে বিরত থাকতে সচেতন হতে হবে মায়েদের।

চলতি বছর মে মাসে ইউনিসেফ প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে নবজাতকদের মাত্র ৫১ শতাংশকে জন্মের ১ ঘণ্টার মধ্যে বুকের দুধ খাওয়ানো হয়। ৬ মাসের কম বয়সি ৫৫ শতাংশ শিশুকে কেবল বুকের দুধ খাওয়ানো হয়। এ হিসাবে বিশ্বে ব্রেস্ট ফিডিংয়ে বাংলাদেশের স্থান তৃতীয়। এ হার আরো বাড়ানোর লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ সপ্তাহ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে শিশুখাদ্য হিসেবে মাতৃদুগ্ধ পানের হার শতভাগ সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

এ দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাণী প্রদান করেন। বাণীতে রাষ্ট্রপতি সমাজ ও রাষ্ট্রের টেকসই উন্নয়ন ও সুস্থ-সবল জাতি গঠনে মায়ের দুধের উপকারিতা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার পাশাপাশি সন্তানকে দুগ্ধদানে মায়েদের উৎসাহিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাণীতে মাতৃ ও শিশু পুষ্টি বিষয়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে দেশের সর্বস্তরের শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর অগ্রগতির ধারাকে জোরদার করার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, জাতীয় পুষ্টি সেবা ও বাংলাদেশ ব্রেস্ট ফিডিং ফাউন্ডেশনসহ সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে একত্রে কাজ করার আহ্বান জানান।

জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস

জ্বালানি নিরাপত্তা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

রোজি আক্তার

স্বাধীন দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য একটি শক্তিশালী জ্বালানি অবকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ই আগস্ট তৎকালীন ব্রিটিশ তেল কোম্পানি 'শেল পেট্রোলিয়াম কোম্পানি লিমিটেড'-এর কাছ থেকে নামমাত্র ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং মূল্যে দেশের ৫টি গ্যাসক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় হস্তান্তরের ব্যবস্থা করেন। এটি বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য একটি মাইলফলক। ৪৩ বছর গ্যাস সরবরাহের পরও বর্তমানে এ ৫টি গ্যাসক্ষেত্রে ৬.৫৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট অর্থাৎ ১,৩৬,৫৩২ কোটি টাকা (প্রায় ১৬.৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) মূল্যের গ্যাস অবশিষ্ট রয়েছে। বর্তমানে এ গ্যাসক্ষেত্রগুলো থেকে মোট সরবরাহের এক-তৃতীয়াংশ গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। জাতির পিতার এ অবিস্মরণীয় অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য সরকার ২০১০ সাল থেকে ৯ই আগস্টকে 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরপর থেকে প্রতিবছর জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের উদ্যোগে 'জ্বালানি নিরাপত্তা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার' স্লোগানকে সামনে রেখে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। বর্তমান সরকার সবসময়ই দেশের জ্বালানি নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। নতুন নতুন কূপ খননসহ গ্যাস সেক্টরে প্রভূত উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্বালানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গৃহীত সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্জিত অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার ওপর সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

অনুসন্ধান কূপ

নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের সময়ে দেশে মোট ১৪টি অনুসন্ধান কূপ খনন করা হয়েছে। এরফলে গ্যাসক্ষেত্রের সংখ্যা ২০০৯ সালের ২৩টি থেকে বর্তমানে ২৭টিতে উন্নীত হয়েছে। ত্রিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে পুরাতন গ্যাসক্ষেত্রসমূহে বেশকিছু নতুন গ্যাস স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে। নতুন গ্যাস মজুত আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে ২০২১ সালের মধ্যে অনশোর ও অফশোরে আরো ৫৯টি অনুসন্ধান কূপ খননের পরিকল্পনা আছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ

২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে গ্যাসের উৎপাদন ছিল দৈনিক ১.৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে তা দৈনিক ২.৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হয়েছে। গ্যাস সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩টি গ্যাস কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এরফলে অতিরিক্ত গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা যাচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, সারকারখানা, শিল্প ও বাণিজ্যিক এবং আবাসিক খাতে বর্তমানে প্রায় ৪১.৮০ লক্ষ গ্রাহকের কাছে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। গ্যাসের ঘাটতি লাঘবের লক্ষ্যে ২০১৮ সালের মধ্যেই ১টি এবং

২০১৯ সালের প্রথমদিকে আরো ১টি Floating Storage Regasification Unit (FSRU) স্থাপনের মাধ্যমে ১০০০ মিলিয়ন ঘনফুট সমতুল্য এলএনজি আমদানির কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন আছে। ভবিষ্যতের গ্যাস চাহিদা পূরণে মহেশখালী, কুতুবদিয়া ও পায়রা বন্দরে এক বা একাধিক স্থলভিত্তিক FSRU স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন

দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে প্রাপ্ত গ্যাস কনডেনসেট সমৃদ্ধ হওয়ায় এ অঞ্চলের অধিকাংশ গ্যাসক্ষেত্রে শুরু থেকে ফ্রাকসনেশন প্ল্যান্টে কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরণ করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন জাতীয় পেট্রোলিয়াম পদার্থ উৎপাদন করা হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ৩২,৯৫,৪৩৬ ব্যারেল গ্যাস উপজাত কনডেনসেট এবং ১,১১,৮৩৯ ব্যারেল এনজিএল উৎপাদিত হয়েছে। বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডে লিকুইড রিকভারি ইউনিট (এলআরইউ) স্থাপনের ফলে প্রাপ্ত বর্ধিত কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরণের জন্য রশিদপুরে এসজিএফএল কর্তৃক দৈনিক ৪,০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন আরেকটি ফ্রাকসনেশন প্ল্যান্ট ডিসেম্বর ২০১৮ নাগাদ স্থাপন সম্পন্ন হবে। এছাড়া ৩,০০০ ব্যারেল ক্ষমতার একটি ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট (সিআরইউ) বাস্তবায়নাধীন আছে। ২০২১ সালের মধ্যে বিভিন্ন

গ্যাসক্ষেত্রে ৩১টি উন্নয়ন কূপ খনন, ২২টি কূপের ওয়ার্কওভার এবং ৫৯টি অনুসন্ধান কূপ খননের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলছে। এ সকল কূপ খননের মাধ্যমে দৈনিক প্রায় ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট অতিরিক্ত গ্যাস উৎপাদন হবে বলে আশা করা যায়।

সঞ্চালন পাইপলাইন

২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৮৩০ কিলোমিটার সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে। পাইপলাইনের সঞ্চালন ক্ষমতা আরো বৃদ্ধিসহ দেশের দক্ষিণ ও উত্তরাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের জন্য ২০২৩ সাল নাগাদ আরো ৮৫০ কিলোমিটার সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।

কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত গ্যাসক্ষেত্রসমূহে উৎপাদিত গ্যাস সঞ্চালনে পাইপলাইন নেটওয়ার্কের সীমাবদ্ধতা দূর করে গ্যাসের চাপ যথাযথ মাত্রায় বজায় রেখে গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য গ্যাস সঞ্চালন নেটওয়ার্কের ৩টি (হবিগঞ্জ জেলার মুচাই, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ ও টাঙ্গাইল জেলার এলেঙ্গা) কৌশলগত স্থানে কম্প্রেসর স্থাপন করা হয়েছে।

কয়লা

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে দেশের একমাত্র উৎপাদনশীল কয়লা খনি বড়পুকুরিয়া থেকে দৈনিক গড়ে ১,২০০ থেকে ১,৮০০ মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলন করা হতো। বর্তমানে সেখানে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি লংওয়াল টপ কোল কেভিং (এলটিসিসি) পদ্ধতিতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৪,০০০ থেকে ৪,৫০০ মেট্রিক টন উন্নতমানের বিটুমিনাস কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে।

গ্রানাইট পাথর

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইন থেকে গড়ে দৈনিক প্রায় ৪,৫০০ মেট্রিক টন গ্রানাইট পাথর উত্তোলন করা হয়। এ গ্রানাইট পাথর রেললাইন, সড়ক, সেতুসহ অন্যান্য নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এলএমজি টার্মিনাল স্থাপন

কক্সবাজারের মহেশখালীর সমুদ্রে প্রতিটি ৫০০ এসএমএসসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) স্থাপনের জন্য ইতোমধ্যে দুটি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। যা থেকে ২০১৮ সালের শেষদিকে ও ২০১৯ সালের প্রথমদিকে জাতীয় গ্যাস গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ শুরু হবে।

একনজরে গ্যাস সেক্টর (জুন, ২০১৮)

বিবরণ	সংখ্যা/পরিমাণ
মোট গ্যাসক্ষেত্র	২৭টি
মোট উৎপাদনরত গ্যাসক্ষেত্র	১৯টি
উৎপাদনরত মোট কূপের সংখ্যা	১১০টি
বর্তমান গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা	২,৭৫০ এমএমসিএফডি
সর্বোচ্চ গ্যাস উৎপাদন (৬ই মে, ২০১৫)	২,৭৮৫.৮০ এমএমসিএফডি
মোট প্রাক্কলিত গ্যাসের মজুত (প্রমাণিত+সম্ভাব্য)	২৭.৭৭ টিসিএফ
প্রারম্ভ থেকে মোট গ্যাস উৎপাদন (ডিসেম্বর, ২০১৭)	১৫.২২ টিসিএফ
বর্তমান অবশিষ্ট গ্যাসের মজুত (প্রমাণিত+সম্ভাব্য), জানুয়ারি, ২০১৮	১২.৫৪ টিসিএফ
বর্তমান দৈনিক চাহিদা	৩,৯৯৬ এমএমসিএফডি-এর অধিক
বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা	৪১.৮০ লক্ষ

জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৮ সময়কালে অর্জিত অগ্রগতি

দৈনিক গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি	১,৫০৩ এমএমসিএফডি
প্রকৃত গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধি	১,০০৬ এমএমসিএফডি
নতুন রিগ ক্রয়	৪টি
দ্বিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে	৬,৬৯৬ লাইন কিলোমিটার (বাপেক্স- ৫,০০৫ ও আইওসি- ১১,৬৯১)
দ্বিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে	৫,২৩৬ বর্গকিলোমিটার (বাপেক্স- ৪,৫২০ ও আইওসি- ৭১৬)
ভূতাত্ত্বিক জরিপ	১৯,৪১২ লাইন কিলোমিটার (বাপেক্স- ১,২৪১ ও আইওসি- ১৮,১৭১)
নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার	৪টি (সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ ও ভোলা নর্থ)
অনুসন্ধান কূপের সংখ্যা	১৪টি (৮টি বাপেক্স, ২টি এসজিএফএল ও ৪টি আইওসি)
উন্নয়ন কূপের সংখ্যা	৫৭টি
ওয়ার্কওভার কূপের সংখ্যা	৪৪টি (৪০টি বাপেক্স ও ৪টি আইওসি)
গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন সম্প্রসারণ	৮৩০ কিলোমিটার
কয়লা উৎপাদন	৮২.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন
গ্রানাইট উৎপাদন	৩২.৮২ লক্ষ মেট্রিক টন

পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন (২০১৭-১৮ অর্থবছর)

পণ্য	এসজিএফএল	বিজিএফসিএল	আরপিজিসিএল	মোট
পেট্রোল	৫,৭৭,৬৪৪ ব্যারেল	৮২,৭৩৬ ব্যারেল	১,৮৩,৯৭৭ ব্যারেল	৮,৪৫,৩৫৮ ব্যারেল
ডিজেল	৮০,৫০৩ ব্যারেল	১,৮২,২৭১ ব্যারেল	৫৪,৮৫৪ ব্যারেল	৩,১৭,৬২৭ ব্যারেল
কেরোসিন	৫৭,৫৬২ ব্যারেল	-	-	৫৭,৫৬২ ব্যারেল
এলপিজি	-	-	৪,১৩৭ মেট্রিক টন	৪,১৩৭ মেট্রিক টন

বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আমদানিসহ দেশে উৎপাদিত ৬২,৪৯৮ গিগাওয়াট আওয়ার বিদ্যুতের মধ্যে ৩৯,৫৬৩ গিগাওয়াট আওয়ার প্রাকৃতিক গ্যাস এবং বড়পুকুরিয়া কয়লা ব্যবহার করে ১,৬৯৬ গিগাওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। এছাড়া ক্যাপটিভ পাওয়ার খাতে ছোটো ছোটো গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র মোট ২,২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে।

খাতওয়ারি গ্যাস ব্যবহার (২০১৭-১৮)

বিদ্যুৎ ৪০.২২%, সিএনজি ৪.৭৬%, গৃহস্থালি ১৬.০৩%, বাণিজ্যিক ০.৮৪%, চা-বাগান ০.১০%, শিল্প ১৬.৮৮%, সার-কারখানা ৪.৮৫%, ক্যাপটিভ ১৬.৩২%

দেশের প্রাথমিক জ্বালানির অন্যতম উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা। বর্তমানে ব্যবহৃত বাণিজ্যিক জ্বালানির প্রায় তিন-চতুর্থাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারা পূরণ করা হয়। এ কারণে প্রাকৃতিক গ্যাসকে বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। আর তাই প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

পুষ্পিত শ্রদ্ধায় নত শির

মোশাররফ হোসেন ভূঞা

পনেরোই আগস্ট রাতে মৃত্যুময় নিস্তব্ধতা ভেঙে
মৌনমুখে অন্ধকার নদীতীরে যখন দাঁড়াই
পিতৃহারা বেদনায় ধসে পড়ে মনের আকাশ
শোকার্ত তরঙ্গ তুলে মধুমতি কেঁদে ফেরে একা।
দ্রোহীকণ্ঠে অন্তর্নীল টুঙ্গিপাড়া নিঃশব্দে আমাকে
প্রশ্ন করে– মুজিবের খুনিচক্র আজকে কোথায়?
ঘাতকচক্রের ফাঁসি হতে আর কতদিন বাকি?
নিষ্পলক চোখে শুধু পৃথিবীর দ্রোহী কান্না দেখি।
আমার চোখের নোনা অশ্রুনদী সুদূরে গড়িয়ে
যেতে যেতে বলে যায় 'বঙ্গবন্ধু' অমর-অক্ষয়
নির্ভীক-নীতির সেই মহাবীর দ্রাবিড় পুরুষ
অগ্নিঝরা একাত্তরে ফাঁসিকাষ্ঠে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে
প্রশস্ত বুকের মাঝে স্বদেশের পটচিত্র এঁকে
দাসত্ব শৃঙ্খল ভেঙে পরিচয় দিয়েছেন বিশ্বে।
গৌরবে আমার বুক ভরে যায়, নিভৃত ক্রন্দনে
বিরাণ বাংলায় শুধু খুঁজে ফিরি স্বপ্নের ঠিকানা
সুনীল মাঠের কাছে শিখে নিতে সাগরের গান–
পুষ্পিত শ্রদ্ধায় নত শির পিতৃ-সমাধিতে।

পিতার মৃত্যুতে

সুহৃদ সরকার

কিছু কিছু মৃত্যু আছে লালমাই পাহাড়ের মতো
মৃত্যু মৃত্যুই নয়, অনাদিকাল ধরে বাঁচা
কোনো কোনো মৃত্যু টর্পেডোর চেয়ে উদ্ধত
তেমনি প্রস্থান তাঁর বজ্রের মহা হুংকার।
তুমি কি অমরত্ব নেবে নাকি নেবে মহা প্রস্থান
যে অমরত্ব এনে দেয় জীবনের মহা জয়গান।
কিছু কিছু শব্দ আছে ব্যাঘ্রের মহা গর্জন
কিছু কিছু বার্তা আছে জনতার মহা অর্জন।
তাঁহার প্রস্থান আহা! কোনো অর্থেই প্রস্থানই নয়
তাঁহার প্রস্থান মানে জীবনের মহত্তম জয়।
তাঁহার মৃত্যুতে আমি একটুও শোকাবহ নই
তাঁহার পতাকাবাহী অতন্দ্র প্রহরী হয়ে আমি জেগে রই।
হে পিতা! তোমার নাম সবার হৃদয়ে লেখা হোক
আজ এই শোক হোক জীবনের শক্তিবহ শোক।

পটভূমি

মনসুর জোয়ারদার

কার জমাট ব্যথায় গড়ে তুলি বৈভব আমার
কার ভাঙা আয়নায় জুড়ে আছে বিজয়ী মিনার?
চেনাজানা সেইসব ক্রমলীন মুখের বাসনা
হৃদয় গভীরে আজও প্রতিধ্বনি তুলতে ভোলে না।
রমণীয় যার মুখ উল্লসিত মধুর হাসিতে
তাকেও দেখেছি আমি কুঁকড়ে থাকতে মায়ের আঁচলে
ছিল না সেদিন তার চোখে কোনো আনন্দ ছড়িয়ে
ছিল শুধু লুণ্ঠিতা হবার এক আশঙ্কা জড়িয়ে
এই যে আধো রবিরশ্মি চারিদিকে আছে ছুঁয়ে
সেও স্বাধীন হয়েছে সূর্যমুখী প্রেমিকা হারিয়ে,
দেশজুড়ে চেনা-অচেনার কত না সাহসী মন
এনেছে সবার জন্য আদিগন্ত সোনালি জীবন।

একাত্তরের বসন্ত আখ্যান

দুখু বাঙাল

শরতের আকাশ জুড়ে শকুনের পাখা হয়েছিল সব ঘন কালো মেঘ
এরই মাঝে শীত এসে একদিন কানে কানে বলে গেল আমাদের
এবার আমি আসিব না– আনন্দ-বেদনা হয়ে আসিবে দুজন
সেই থেকে পথ চাওয়া, প্রহর গোনার দিন দিবস-রজনী
তবে আগাগোড়া গ্রীষ্ম ছিল, আমরা যার খরতাপে হয়েছি অঙ্গার
বর্ষা সেও আসিল কী আসিল না বুঝে ওঠা ছিল অতি ভার
কারণ, নিজেরাই বৃষ্টি হয়ে সবুজ এক জমিনের স্বপ্ন বুনেছিলাম
এবং রক্তের ঝর্ণা হয়ে অবিরাম বিজয়ের ছবি এঁকেছিলাম
ডিসেম্বর চিরকাল কনকনে শীতঝরা পৌষের উত্তুরে হাওয়া
ষড়ঋতুর এই দেশে প্রকৃতির নিয়ম ভাঙল সে-ই একবার
কার আগমনে এত ছাড়? তবে কি আসিবে ঋতুরাজ!
অবশেষে যমজ ভাইয়ের মতো এসেছিল শুভক্ষণে ওরা দুইজন
ঝরাপাতার মর্মর ধ্বনি তুলে শূন্যতায় বিস্তারিয়া বিষাদের ছায়া
সমুদ্রের বার্তা নিয়ে বইছিল ক্ষণে ক্ষণে দক্ষিণের অদম্য বাতাস
ডিসেম্বর, ৭১– পৌষ আসিলেও শীত আসিল না, আসিল না পাখি
শীত তার কথা রাখিয়াছে– হেমন্তের হাত ধরে বসন্ত এসেছে
হেমন্তের খা খা মাঠে ত্রিশ লক্ষ বাংলা নাম চিকচিকে সোনা হয়ে গেল
সম্ভ্রম লুণ্ঠিত দুই লক্ষ গৃহকলা পিতৃছায়ায় বসন্তের ফুল হয়ে গেল
জলদগম্ভীর স্বরে আলোড়িত হতে থাকল আমাদের ভিতর বাহির
'আর যদি একটি গুলি চলে...'

শোকে বিহ্বল

সাঈদ তপু

পথের দুধারে নেতানো কলমিলতা,
ধানক্ষেতে সদ্য ফোটা
নবীন ধানের থোড়
ডাহুকের ডাকে ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যা
অথবা, কলসি কাঁখে গৃহিণীর
জেগে ওঠা ভোর
অথবা, নদনদীর উৎসমূল ঝর্ণার জল
যে যেথায়–আমি, আমরা
সবাই শোকে বিহ্বল।
আকাশের হাহাকার বজ্রের
চিৎকার হয়ে কানে বাজে,
মাটির ক্রন্দন শুনি
এ বুকের মাঝে অবিরত,
তোমাকে হারানোয় যতটা ক্ষতি
তারচেয়েও বেশি হৃদয়ের ক্ষত।
তুমি ছিলে বাংলার মুখ, বাঙালির প্রাণ
মুক্তির ঘ্রাণ ছড়িয়েছ বন্দি শিবিরে
নিবিড় বন্ধনে এঁকেছ বাহু
উবে গেছে রাহু
রাতের খোয়াব দিবসে করেছ সত্যি
এর মিছে নয় এক রত্তি।
স্বাধীন পথচলা শিখেছে জাতি
তোমার হাত ধরে
দুহাতে দিয়েছ শুধু
নাওনি কিছুই লাভের ঘরে
তাইতো আগস্ট এলে–
গাঁয়ের শালবন, শহুরে রাজপথ
একাকার চোখে জল
ওরা সবাই শোকে বিহ্বল, নিভৃতে কাঁদে
যখন মনে পড়ে–
খুনির বুলেটে তোমার বুকের তাজা রক্ত
সিঁড়ি বেয়ে মেশে বঙ্গোপসাগরে–
সেই অপরাধে।

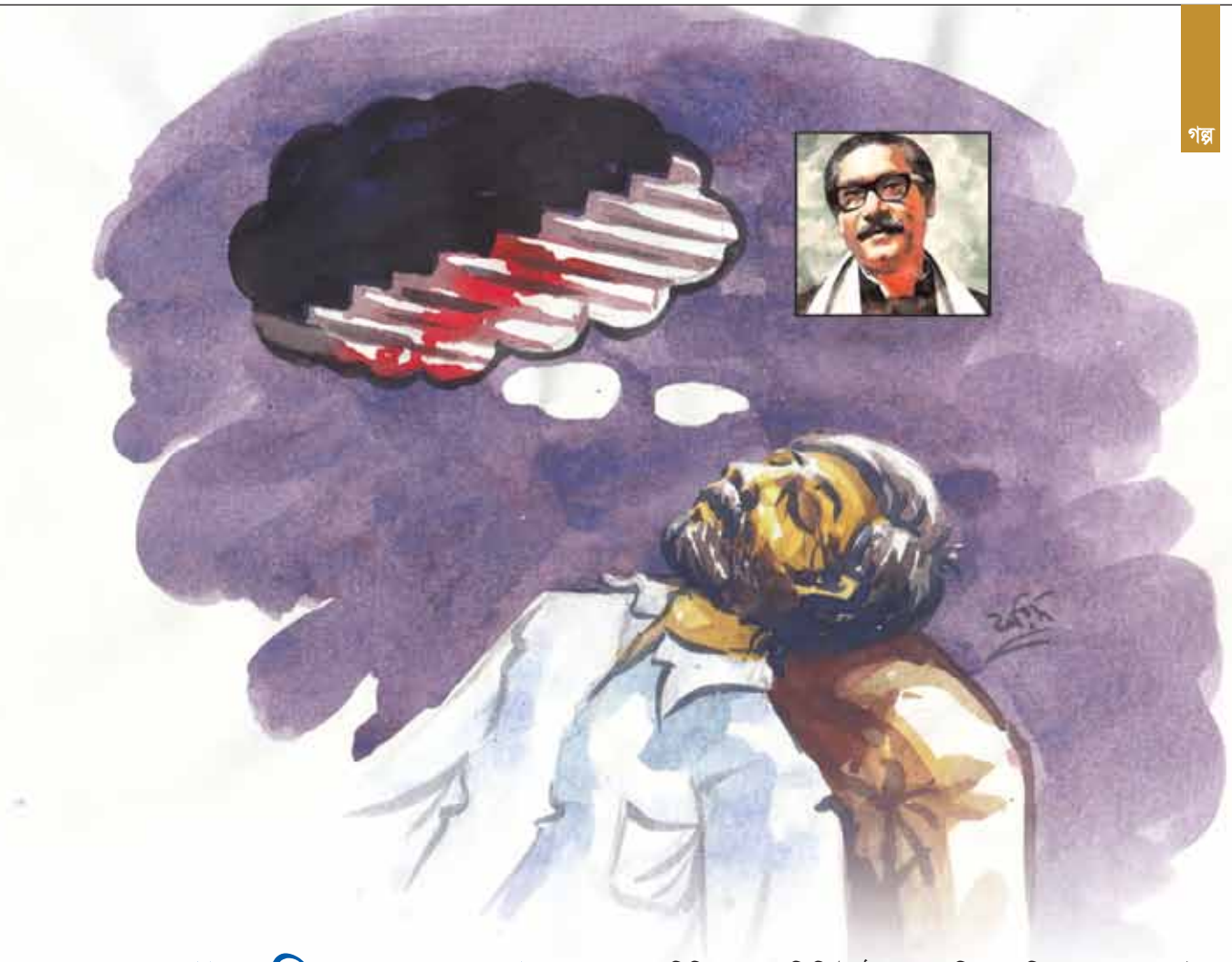

শোক দিবসের অধ্যাস

রফিকুর রশীদ

বউ সাথে করে বাইরে যাবার সময় রায়হান বাবাকে বলল, তুমি বাসাতেই থাকো, আমরা একটু ঘুরে আসছি।

রায়হানের বাবা জলিল মাস্টার গ্রাম থেকে এসেছেন দুদিন হলো। ছেলের বাসায় আগে কখনো আসা হয়নি। কল্যাণপুর বাসস্টান্ডে নেমে অনেক খুঁজে খুঁজে শুক্রাবাদের এই বাসায় উঠেছেন। শুক্রাবাদ হাই স্কুলের পেছনের এই এলাকাকে যে পান্থপথও বলা হয়, এখানে আসার পর সেটা জেনেছেন। এসে নাগাদ ছেলে আর বউমার কাণ্ডকীর্তি দেখছেন। দুজনেই চাকরি করে; কী চাকরি সে খবর খুব স্পষ্ট করে জানা নেই জলিল মাস্টারের। সকালবেলা দুজনেই বেরিয়ে যায় বাসা থেকে, ফিরে আসে সন্ধ্যার পর। দুদিন তো তা-ই দেখছেন জলিল মাস্টার। আজ একটা বাড়তি ছুটির দিন। এ সরকার বিদায় নিলে এ ছুটি আর মিলবে! তো এই ছুটির দিনেও তাদের বাইরে কত কাজ! সারাদিন বুকে কালো ব্যাজ সেঁটে ঘুরে এল রায়হান, এখন আবার বউ সাথে করে বেরুচ্ছে, কখন যে ফিরবে আল্লা মালুম!

বেরুনোর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে রায়হান বলল, রাতের বেলা তুমি তো আর বাইরে যাচ্ছ না, দরজাটা বাইরে থেকে লক করে যাচ্ছি। ঘরে বসে কাগজ পড়ো, টিভি দ্যাখো। আমরা আসছি। জলিল মাস্টার একবার চোখ তুলে তাকাতেই রায়হান দরজার মুখ থেকে ব্যাখ্যা দেয়–এটা ঢাকা শহর। দরজা খোলা থাকলেই বিপদ।

জলিল মাস্টার কিছুই বললেন না। দরজায় তালা লাগিয়ে ওরা গটগট করে সিঁড়ি ভেঙে নেমে যায়। ওদের পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। তিনি উঠে ফ্যানের স্পিড বাড়িয়ে এসে চেয়ার টেনে বসতেই বন্ধ দরজায় দৃষ্টি আছড়ে পড়ে, নিজেকে ভয়ানক বন্দি মনে হয়। না, ড্রয়িংরুম, গেস্টরুম, বেডরুম কোনোটাই বন্ধ নয়। ইচ্ছে করলে এ-ঘর থেকে ও-ঘর যেতে কোনো বাধা নেই। বাধা কেবল বাইরে বেরোতে। মেইন গেট লক করা। তা এই রাতের বেলা তিনি যাবেনই বা কোথায়! দিনের বেলাতেই পথঘাট ভুলভাল হয়ে যায়। আর রাতের বেলা তো কথাই নেই। কোথায় কোন গলি, ঘুপচির মধ্যে পথ হারিয়ে তালকানা হয়ে ঘুরতে হবে তার ঠিক আছে?

কিন্তু সন্ধ্যার পর জলিল মাস্টারের এক খিলি পান মুখে দিতে ইচ্ছে করছে যে! পান-তামাকে তিনি যে প্রবল নেশাগ্রস্ত এমন নয়। ধূমপানের তীব্র নেশা চাপা দিতে গিয়ে সারাদিনে দু'চার খিলি পানের অভ্যেস হয়েছে। সকাল-সন্ধ্যা অন্তত দু'খিলি পান না হলে বেশ অস্বস্তি হয়। সব দিকে কড়া নজর রায়হানের। বাসার নিচে গলির মুখের দোকান থেকে বেশ কটা স্পেশাল অর্ডারের পানের খিলি কাগজে মুড়ে নর্মাল ফ্রিজের ডালায় রেখে বউকে বলেছে, চায়ের পরে বাবাকে দিও। ব্যস্ততার মধ্যেই বউমা এত কথা মনে রাখে কী করে! এই যে সন্ধ্যার পর বাইরে বেরোনোর তাড়াহুড়োর মধ্যেও শ্বশুরকে নুডুল্‌সের সঙ্গে চা দিয়েছে ঠিকই, পানের কথাটা আর মনে পড়েনি। এমন তো হতেই পারে! চায়ের স্বাদটা এখন তিতকুটে বিস্বাদ হয়ে জিহ্বায় ছড়িয়ে পড়লে জলিল মাস্টার কী করবেন? অগত্যা পায়ে পায়ে চলে আসেন ডাইনিং রুমে। ফ্রিজের ডালা মেলে ধরেন–নাহ্, পান কই! ভেজা ন্যাকড়ায় জড়িয়ে পানি ছিটিয়ে রাখা পান আজ সকালেও একটা খেয়েছেন। তবে কি স্টক ফুরিয়ে গেল! মনটা ভারি রেজার হয়ে গেল। মুখভরা তিতকুটে বিস্বাদ নিয়ে ড্রয়িংরুমে এসে টিভি ছেড়ে দিলেন। কী আশ্চর্য! রিমোটে কাজ করছে না। পাওয়ারই অন হচ্ছে না, তো টিভি চলবে

কী! অথচ আজ সকালেও তিনি একা একা টিভি চালিয়ে বিভিন্ন চ্যানেলে শোক দিবসের অনুষ্ঠান দেখেছেন। আবার নিজ হাতে রিমোটের বোতাম টিপে বন্ধও করেছেন টিভি। হঠাৎ সেই রিমোটের হলোটা কী! বাম হাতের তালুতে দুবার ধাক্কাধাক্কি করে তিনি রিমোট ছুড়ে দিলেন ডানদিকের সোফার ওপর। পিঠ এলিয়ে দিলেন বিরক্তিতে। তখনই নজরে পড়ে বামদিকের ছোট্ট টি-টেবিলের ওপরে সাদা ধবধবে পিরিচে পড়ে আছে এক খিলি পান। অবাক কাণ্ড, এখানে পান এল কোত্থেকে! বাব্বা! রাংতা কাগজে মোড়া! দেখে মনে হবে বুঝি-বা এক্ষুণি দোকান থেকে সাজিয়ে এনে রাখা হয়েছে। বউমা পারেও বটে। অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে পানের খিলি মুখে পুরতেই চমকে ওঠেন জলিল মাস্টার, হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকানোর মতো করে টেলিভিশন চালু হয়ে গেল, কোন চ্যানেলে যেন বঙ্গবন্ধু তখন আঙুল উঁচিয়ে সেই অমর ঘোষণা দিচ্ছেন–এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।

সারাদিন ধরে সবগুলো চ্যানেলে যেন-বা একই অনুষ্ঠান ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রচার হচ্ছে–বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে যত কথা, যত গান, যত কবিতা। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার নিয়ে কত যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ক্যাদ্দানি চলছে, ওসব আর শুনতে ইচ্ছে করে না। নতুন কথা কিছু নেই। কী সেই নতুন কথা! বঙ্গবন্ধু আবার ফিরে আসবেন! সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আবারো গণসংবর্ধনা হবে! তাঁর চতুর্পার্শ্বে আবারো ঘিরে থাকবেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপটেন মনসুর, কামারুজ্জামান! কোথায় নতুন স্বপ্ন! এসব কথা ভাবতেই জলিল মাস্টারের বুকে হিক্কা উঠে পড়ে। কী জানি পানের ভেতরে জর্দার পরিমাণ বেশি ছিল কি-না! হঠাৎ তার মনে হয় টেলিভিশনের চ্যানেলটা বদলে দিতে পারলে হিক্কা থেমে যেত। রিমোট কাজ করছে না, তবে কি সোফা থেকে উঠে গিয়ে ম্যানুয়ালে চেঞ্জ করবেন চ্যানেল! নাহ, তাতেও আলস্য। সকালের বাসি কাগজটা হাতে নিয়ে আনমনে পাতা উলটান। ছবি দেখেন। মোটা অক্ষরের শিরোনাম-উপশিরোনাম দেখেন। কোথাও নতুন খবর নেই। কখন, কী কী পদক্ষেপ নিলে ১৫ই আগস্টের এই মর্মান্তিক ট্রাজেডি এড়ানো যেত, সেই বিশ্লেষণও কোথাও নেই। খবরের কাগজ টেবিলে ছুড়ে দিয়ে টিভির সামনে আঙুল উঁচু করতেই সহসা চ্যানেল চেঞ্জ হয়ে গেল। জলিল মাস্টার ভীষণ অবাক! অবিশ্বাসের চোখে তাকান পাশে পড়ে থাকা নির্বোধ রিমোটটির দিকে। তারপর আবার আঙুল উঁচু করেন। আবারো পালটে যায় চ্যানেল। না, ভারতীয় চ্যানেলের রংবাহারি ড্যান্স তাঁর ভালো লাগে না। আঙুল তুলে আবার চ্যানেল চেঞ্জ করেন। ফিরে আসেন বাংলাদেশে।

বাংলাদেশের এটা কোন চ্যানেল, কী অনুষ্ঠান হচ্ছে সেদিকে মনোযোগ দেবেন কি-না, জলিল মাস্টারের বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি পড়ে থাকে নিজেরই ডানহাতের শাহাদৎ আঙুলের প্রতি। কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন না–তাঁর সামান্য এই আঙুল এমন অসামান্য ক্ষমতা কী করে পেল! আবার আঙুল তুলে চ্যানেল বদ্‌লাতেই দৃষ্টি চলে যায় বঙ্গবন্ধুর সেই আকাশছোঁয়া আঙুলের দিকে। ভালো করে তাকিয়ে দেখেন তিনি–বঙ্গবন্ধুর কোন হাত ওটা, কোন হাতের কোন আঙুল? জলিল মাস্টারের সারা গায়ে কাঁটা দেয়, লোম শিউরে ওঠে এবং অবশেষে টের পান–নিজের ওই বিশেষ আঙুলটি শিরশির করে কেঁপে উঠছে, আঙুলের ভেতরে কী এক অনন্যসাধারণ বোধ সঞ্চারিত হচ্ছে। একবার নিজের ওপরেই অবিশ্বাস হয়, এ আঙুল কি তবে তার নয়, বঙ্গবন্ধুর সেই ৭ই মার্চের জাদুকরি আঙুল, সাড়ে ৭ কোটি মানুষকে পথনির্দেশ দিয়েছে যে আঙুল!

এতক্ষণ আঙুলের আস্ফালন দেখতে গিয়ে জলিল মাস্টার ভুলেই গিয়েছিলেন তার গালের মধ্যে জর্দামাখা পান ঠাসা আছে, দাঁতের হামানদিস্তায় সেটা পিষতে হবে, রস নিংড়ে নিতে হবে। দু'চারবার চিবোতেই সারা মুখ তিতকুটে বিস্বাদে ভরে যায়, গলার কাছে বুনো কচুর তরকারির মতো কিটকিট করে এবং আবারো হিক্কা উঠতে চায়। জলিল মাস্টার এদিক-ওদিক তাকিয়ে পিকদানিটা খোঁজেন, বাবার অসুবিধার কথা ভেবে রায়হান প্রথম দিনেই পিকদানি এনে দিয়েছিল; কিন্তু সেটা গেল কোথায়! গালের ভেতরে জমা পিক সামলাতে না পেরে তিনি দ্রুত উঠে যান বেসিনের কাছে। ওয়াক করে পিক ঢেলে দেন বেসিনে। পানের পিক নয়, যেন-বা লাল টকটকে রক্তে ডুবে যায় সাদা বেসিন। ট্যাপ ঘুরিয়ে সর্বোচ্চ বেগে পানি ছেড়ে দেন। পানিতে ভরে ওঠে বেসিন। কিন্তু পানি কই, বেসিনভরা রক্ত যে! জলিল মাস্টারের চোখের মণি ফেটে বেরোয়–রক্ত এত লাল! কার রক্ত?

ড্রয়িংরুমে ফিরে আসতেই নজরে পড়ে সোফার পাশে ছোট্ট সাইড টেবিলের নিচে রুপালি পিকদানি তাকে দেখে হাসছে। আবার বিভ্রম হয়, পিকদানিটি কি কিছুক্ষণ আগেও ওইখানে ছিল! নাহ্, মনে পড়ে না সেটা। ওটা কি গত দুদিনের ব্যবহৃত পিকদানি, নাকি রক্ত গোলাপে ঠাসা ফুলদানি! মনের ভেতরের ঘোর কাটে না নিঃসংশয়ে, ভয়ানক ক্লান্তিতে তিনি শরীর এলিয়ে দেন সোফাতে।

এদিকে টেলিভিশন চলছে।

মানুষ ইচ্ছে করলেই চোখ বুজতে পারে, কান বন্ধ করবে কী করে! জলিল মাস্টার সোফাতে মাথা হেলিয়ে চোখ বন্ধ করেছেন; তবু চোখের ক্যানভাস থেকে রক্তভরা বেসিন এবং রক্তাক্ত পিকদানির ছবি কিছুতেই সরাতে পারছেন না; এরই মাঝে টিভি চ্যানেলে কে যেন প্রত্যয়দৃঢ় কণ্ঠে গেয়ে ওঠে–'যদি রাত পোহালেই শোনা যেত বঙ্গবন্ধু মরে নাই'।

গানটির অবশিষ্ট কথা শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রহণ করে কি-না বুঝা যায় না, কানের দরজায় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে–'বঙ্গবন্ধু মরে নাই' এই বাক্যবন্ধটুকু। জলিল মাস্টার হঠাৎ খাড়া হয়ে উঠে বসেন, নিজেকেই প্রশ্ন করেন, বঙ্গবন্ধু মরে নাই? টিভির পর্দায় চোখ পড়তেই দেখতে পান–বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের প্রতিটি কক্ষের দৃশ্য দেখানো হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর ব্যবহৃত জিনিসপত্র, জামাকাপড়, পাইপ, চশমা, কলম, বইপত্র, উপহারসামগ্রী, বুলেটবিদ্ধ ঘরের দেয়াল, রক্তাক্ত সিঁড়ি–খুঁটিনাটি সবকিছু। গতকাল একা একাই জাদুঘরে গিয়ে এসব দেখে এসেছেন জলিল মাস্টার। এখান থেকে কতই-বা দূর। বড়ো রাস্তাটা পেরোলেই হলো, তারপর জনতার স্রোত ঠিকই নিয়ে যাবে ৩২ নম্বরে। সেই স্রোতে মিশেই তিনি গিয়েছিলেন। সারাদিন ঘুরে ঘুরে সবকিছু দেখেছেন। আজ দেখছেন টেলিভিশনের পর্দায়। বঙ্গবন্ধুর বুলেটবিদ্ধ ছবিটি দেখে তিনি সহসা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, মুখে বিড়বিড় করেন–'বঙ্গবন্ধু মরে নাই'।

সোফার হাতলে দু'হাতের ভর রেখে সটান উঠে দাঁড়ালেন জলিল মাস্টার। এই বন্দিত্ব থেকে বেরিয়ে তিনি নিচে যাবেন। রাজপথের মিছিল দেখবেন। স্লোগান শুনবেন। তারপর ফেরার পথে গলির মাথার দোকান থেকে চমনবাহার দিয়ে এক খিলি পান খাবেন। মেইন গেটে পৌঁছুনোর পর তাঁর মনে পড়ে যায়, রায়হান বাইরে থেকে লক এঁটে রেখে গেছে। এখন উপায়! অসহায় ভঙ্গিতে দরজার হাতলে হাত রাখতেই অবাক–দরজার দুই পাল্লা হা হয়ে খুলে গেল। তবে কি ওরা যাবার আগে তালা না লাগিয়ে বাবাকে মিছেমিছি ভয় দেখিয়েছে! নাকি সত্যি সত্যি আজ তার ডান হাতের তর্জনিতে ৭ই মার্চের অলৌকিক আঙুলের সম্মোহনী শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে! কিন্তু এ কী! মেইন গেট পেরিয়ে সিঁড়ির মুখে আসতেই বিদ্যুৎ চলে গেল যে! সঙ্গে সঙ্গে নিকষ কালো অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ে সর্বত্র।

তখন কী করবেন জলিল মাস্টার? সামনে নাকি পেছনে যাবেন! সিঁড়ির দিকেই তাকিয়ে থাকেন আকুল হয়ে। প্রগাঢ় অন্ধকার সামান্য একটু চোখ-সওয়া হয়ে আসতেই তিনি অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন–অন্ধকার ফুঁড়ে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে উপরে উঠছেন বঙ্গবন্ধু। চোখে সেই চশমা, চুলে সেই ব্যাক ব্রাশ, সাদা ধবধবে পাজামা-পাঞ্জাবির ওপরে কালো মুজিব কোট; ঠোঁটে ঝুলছে টোবাকো পাইপ। তিনি উঠছেন, অন্ধকার পথ কেটে দিচ্ছে। আলোর দেবতা আলো ছড়াতে ছড়াতে উপরে উঠছেন। উপরে মানে যে কোথায়, কত উপরে সেসবের কোনো ধারণাই নেই তাঁর।

যতদূর দৃষ্টি যায় জলিল মাস্টার উপরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। সিঁড়ি প্যাঁচিয়ে প্যাঁচিয়ে আলোর দূত উপরে উঠে যান। এই বিল্ডিং তো সাত তলা, এরপর তিনি আর কত উপরে যাবেন। ভেবে পান না–এখানে কেন এসেছেন তিনি, এখানে কী কাজ! জলিল মাস্টার সিঁড়ি ভেঙে উপরে যেতে সাহস পান না, পা ওঠে না; তিনি নিচেই নামবেন। কিন্তু এদিকে যে নিরেট অন্ধকার! অগত্যা ডানদিকের দেয়ালে হাত রাখেন, দেয়াল ঘেঁষে অনুমাননির্ভর পা ফেলে ধীরে ধীরে ঠিক নেমে যাবেন, এমনই ভাবছেন। হঠাৎ ডান হাতের তর্জনিতে ছোট্ট একটা সুইচ বোর্ডের নাগাল পান। আর তক্ষুণি সিঁড়িজুড়ে আলো জ্বলে ওঠে ফকফকা। তিনি কি সুইচ টিপেছিলেন! নাকি ওই শাহাদৎ আঙুলের ছোঁয়া লেগে এরকম আলাউদ্দীনের চেরাগ জ্বলে উঠল এবং তিনি চমকে উঠলেন।

জলিল মাস্টার গলির মুখে এসে দেখেন পানের দোকান খোলা আছে ঠিকই, অন্ধকারে ঢেকে আছে সারা এলাকা। অধিকাংশ দোকানে জ্বলছে টিমটিমে কুপির আলো। দু'একটা দোকানে চার্জার লাইট জ্বলছে। তবু গা-ছমছমে ভৌতিক পরিবেশ যেন চেপে বসে আছে। এরমধ্যেই পানের অর্ডার দেবেন? নাহ্, মন সরে না। ভুতুড়ে অন্ধকারে কি ঠিকমতো পান বানাতে পারবে! চুনের অনুপাতে একটুখানি তারতম্য হলেই তো গালমুখ জ্বলেপুড়ে ঝালাপালা। থাক, সামনের রাস্তা পর্যন্ত একটু হাঁটাহাঁটি করে ফেরার পথে পান মুখে দেবেন। ততক্ষণে বিদ্যুৎ চলে এলে তো কথাই নেই। দেখেশুনে চমনবাহার দিয়ে পান সাজিয়ে নেওয়া যাবে।

ঢাকা শহরে গাড়িঘোড়ার যে উৎপাত, ফুটপাতেও নিরাপদে পা ফেলার উপায় আছে! হরেকরকম যানবাহন আর মানুষে গিজগিজ করছে দিনরাত। কে যে কখন কার গায়ের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়বে বলা মুশকিল। অতি সাবধানে গা বাঁচিয়ে চলার পরও জলিল মাস্টার নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না। চট্টগ্রাম অভিমুখী-গ্রিনলাইনের কাউন্টারের সামনে থেকে বদরাগী এক মোটরসাইকেল তেড়ে এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল রাস্তায়। মোটরসাইকেল আরোহী দুই যুবক আর পেছনে তাকায়নি, সঙ্গে সঙ্গে ফুল স্পিডে কেটে পড়ে নিরুদ্দেশে। স্থানীয় কেউ একজন জলিল মাস্টারকে পাঁজাকোলে তুলে নিরাপদে নিয়ে আসে এক ওষুধের দোকানের সামনে। বড়ো কোনো অঘটন ঘটেনি বটে, তবে হাঁটু এবং কনুইয়ের কাছে থেঁতলে রক্তাক্ত হয়েছে জামা-পাজামা। খানিকটা স্বাভাবিক হবার পর জলিল মাস্টার জানান–তিনি নিজেই বাসায় যেতে পারবেন, এই তো শুক্রাবাদে ছেলের বাসা। জামার পকেট হাতড়ে রায়হানের বাসার ঠিকানা বের করে দেখান। পরোপকারী লোকটি তবু বগলের তলে হাত লাগিয়ে টেনেটুনে বাসার কাছে পৌঁছে দিয়ে গেলে কৃতজ্ঞতায় চোখ ভিজে আসে তার।

সারা দেহের সমস্ত শক্তি পায়ের পাতায় এনে জড়ো করে জলিল মাস্টার সিঁড়িতে পা রাখেন। ভাগ্যিস রায়হানের বাসা দোতলায়, আরো উপরে হলে কী যে হতো! দোতলা পর্যন্ত উঠতে সিঁড়ির প্রথম প্যাঁচ ঘুরতেই তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন, এখানে রক্তের ধারা এল কোত্থেকে! আতঙ্কে উৎকণ্ঠায় গলা শুকিয়ে কাঠ। উদ্বিগ্ন চোখে উপরের দিকে তাকাতেই আর্তনাদ করে ওঠেন। সিঁড়িতে পড়ে আছে বঙ্গবন্ধুর বুলেট-ঝাঁঝরা নিথর দেহ। রক্তের আলপনা এঁকেবেঁকে নেমে গেছে নিচে, দক্ষিণে একেবারে বঙ্গোপসাগরে। জলিল মাস্টার এখন এই রক্তপ্রবাহ, এই প্রাণহীন দেহ অতিক্রম করে কীভাবে উপরে উঠবেন! বউমাকে সঙ্গে নিয়ে রায়হান কি এতক্ষণে ফিরে এসেছে! এই রক্তাপ্লুত সিঁড়ি মাড়িয়ে ওরা বাসায় ঢুকল কী করে! ভেবে পান না–এ কী করে সম্ভব? বঙ্গবন্ধুর মরদেহ এখানে এল কেমন করে?

হাঁটু মুড়ে বসে পড়েন জলিল মাস্টার। রক্তাক্ত সিঁড়ির ওপরে লেপ্টে বসে বঙ্গবন্ধুর ঝুলেপড়া মাথাটা দু'হাতে কোলের ওপরে তুলে নেন। নিথর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন অপলক। হঠাৎ চমকে ওঠেন, বঙ্গবন্ধুর ঠোঁট জোড়া কি একটু নড়ে উঠল? কী যেন বলতে চান মনে হয়। কী বলবেন নেতা? আবারো কি বলবেন–আর যদি একটা গুলি চলে...। যদি চলেই গুলি তাহলে কী করতে হবে সে নির্দেশ আর শোনা হয় না। পিতৃহারা পুত্রের মতো হাউমাউ করে কেঁদে ওঠেন জলিল মাস্টার। বঙ্গবন্ধুর স্পন্দনহীন বুকের ওপরে আকুল হয়ে লুটিয়ে পড়েন এবং বিরামহীন কাঁদতেই থাকেন।

কখন যেন রায়হান এসে বাবার গায়ে মৃদু ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, তার কণ্ঠে মৃদু ভর্ৎসনা ফুটে বেরোয়–বিছানায় গিয়ে ঘুমুলেই তো পারতে বাবা। সোফাতে বসে ঘুম হয়?

আমি ঘুমাচ্ছিলাম! জলিল মাস্টারের চোখে বিস্ময়, উদ্বেগ আর আতঙ্কের মাখামাখি।

ঘুমের মধ্যে খুব কষ্ট পাচ্ছিলে বাবা। তুমি কি কাঁদছিলে?

ধসমস করে উঠে বসেন জলিল মাস্টার। হাতের তালুতে চোখ রগড়ে বলেন, কই না তো! মুখে অস্বীকার করলেও তিনি সোফা ছেড়ে উঠে পড়েন। চোখমুখ থেকে দুঃস্বপ্নের ছায়া মুছে ফেলতে দ্রুত পায়ে চলে যান বেসিনের কাছে। ট্যাপ ছেড়ে পানির ছিটা দেন মুখমণ্ডলে। আর ঠিক তখনই বেসিনের ওপরে দেয়ালে সাঁটা আয়নায় বঙ্গবন্ধুর ছবি দেখে আর্তনাদ করে ওঠেন–ক্ষমা কর পিতা, আমরা প্রতিবাদ করতে পারিনি।

রায়হান ছুটে আসে এ ঘরে। বাবার পেছনে দাঁড়িয়ে জানতে চায়;

কী বলছ বাবা! তোমার কি শরীর খারাপ করছে?

আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে ছেলের মুখের দিকে তাকান জলিল মাস্টার। ছেলের কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন,

ওই যে আয়নার ভেতর থেকে বঙ্গবন্ধু কী যেন বলছেন।

সংকটটা ধরতে পারে রায়হান। বাবার হাত ধরে সে বুঝাতে চেষ্টা করে,

আয়নার ভেতরে বঙ্গবন্ধু কোথায়? বঙ্গবন্ধু আছেন তোমার পেছনে। এই যে বাবা, তুমি তাকাও পেছনে।

পেছনের দেয়ালে সত্যি সত্যিই বঙ্গবন্ধুর ছবি টানানো আছে। জলিল মাস্টার পেছনে ঘুরে অবিশ্বাসের চোখে তাকান সেই ছবির দিকে। রায়হান বুঝিয়ে বলে–দেয়ালের এই ছবিটার প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেছে আয়নায়।

জলিল মাস্টার অবাক হন, আজ দুদিনে কই নজরে পড়েনি তো এই অবিস্মরণীয় ছবিটি। এ ছবি কি এখানেই ছিল?

না বাবা, আজই এটা টাঙিয়েছি এখানে। ছবির দিক থেকে চোখ নামিয়ে রায়হান বাবাকে আশ্বস্ত করে–ঘরে বঙ্গবন্ধুর ছবি থাকলে সাহস বাড়ে বুকে।

পুত্রের কথা শোনেন। দেয়ালে টানানো ছবির দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকান। আবার আয়নার প্রতিবিম্বের সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মিলিয়ে দেখেন। জলিল মাস্টারের চোখ থেকে তবু বিভ্রমের ঘোর কাটে না।

ইতিহাসের কবি

মীর জামাল উদ্দিন

টুঙ্গিপাড়ার একটি ছেলে শেখ মুজিবুর-খোকা,
সাহস নিয়ে এগিয়ে যেত সে ছিল একরোখা।
বিদ্যালয়ের ছাদে ফাটল, কেউ কি ছিল বলার?
সাহসী বীর মুজিব এসে পথ আগলে চলার–
মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বলল, চাই মেরামত আগে,
দেশ জনতার সেবার কাজে দরদি মন জাগে।
সেই ছেলেটি দিনে দিনে আরো বড়ো হয়,
ভাষার দাবি, স্বাধিকারে তাঁর সে পরিচয়।
জেলজুলুম ও অত্যাচারে বন্দি করে রাখে,
বশ করা কি এতই সহজ শাসক শ্রেণি তাঁকে?
যৌবনের সে মধুর সময় জেলখানাতে বসে,
বাংলা মায়ের রাহুমুক্তি-স্বাধীনতা কষে।
তাঁর সে কথা সমস্বরে কোটি প্রাণে ধরে,
সোনার ছেলে মুজিবুরকে 'বঙ্গবন্ধু' করে
তাঁর ডাকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বীর জনতা লড়ে,
যুদ্ধ করে আনল বিজয়, দেশকে স্বাধীন করে।
বিশ্বজুড়ে মানচিত্রে বাংলাদেশের ছবি,
বঙ্গবন্ধু অনন্য এক ইতিহাসের কবি।

প্রেরণা

নুরুন্নাহার নাজমা

আজও পদ্মা, মেঘনা, যমুনা বহমান
আজও সূর্য ওঠে চাঁদ হাসে
আজও রাত শেষে দিন আসে
আজ নেই শুধু মহান নেতা সেইজন।
যিনি শ্রেষ্ঠ বাঙালি, শ্রেষ্ঠ নেতা, শ্রেষ্ঠ সন্তান, জাতির পিতা
শ্রেষ্ঠ বন্ধু বঙ্গবন্ধু, শেখ মুজিবুর রহমান।
শোষিত-নিপীড়িত বাঙালির পাশে
ছিলেন জীবনের পুরো সময়
বঞ্চিত জাতিকে উদ্ধারের মানসে
নেতৃত্ব দিয়েছেন অধিকার আদায়ে।
স্বপ্নে ছিলেন বিভোর সোনার বাংলা গড়ার
আশায় বেঁধেছিলেন মন বাঙালির উন্নত জীবনের।
সংকল্পে দৃঢ় হৃদয়ে মহান
বিশ্বাসে অটল ভালোবাসার ভাণ্ডার।
জন্ম হয়নি একদিনে তাঁর
কঠিন সংগ্রামে জ্বলে উঠেছিলেন
বাংলার আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র
হাল ধরেছিলেন ক্রান্তিক্ষণে।
পথ দেখালেন বাঙালিকে
দিলেন ডাক স্বাধীনতার।
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'
ঐতিহাসিক সেই ভাষণ হলো সত্য
শোষণ-বঞ্চনা থেকে মানুষ হলো মুক্ত
যে ভাষণে মানুষ এখনো হয় উদ্বেলিত
মানসপটে ভেসে ওঠে মুক্তিযুদ্ধ।
কখনো হৃদয় হয় বেদনার্ত
স্বাধীনতা বিরোধীদের আস্ফালনে
সুফলভোগী সবাই এরা
সুযোগ পেলেই ছোবল মারে।
একদিন বিশ্বাসঘাতকদের বিষাক্ত ছোবলের বলি হলেন পিতা
জীবন দিতে হলো পরিবারসহ
বাঙালি যে হলো নিঃস্ব
তাই আজও কাঁদে বাংলার আকাশ বাতাস।

নিয়মের জোয়ারে

আ. আউয়াল রণী

কে বলেছে,
তুমি চলে গেছো?
তোমার তো সব স্মৃতি রইল
তা কি অনুভব করিনি আমরা?
জীবনের রং-তামাশা
হাসি-কান্না সুখ-দুঃখ
নয়ন জল, পদচিহ্ন
জ্বলন্ত প্রমাণ রেখেছে চেয়ার টেবিল আর সারিবদ্ধ ফাইল।
নানা আয়োজনের সভায়
কর্তব্য দায়িত্ব ছিল প্রাণঢালা।
কাঁধে কাঁধ হাতে হাত
সাদর আমন্ত্রণের আলিঙ্গন।
কত দুখিজনের দুঃখ-কষ্ট
আশ্রয়, বন্ধনের সমাধান হয়েছে তোমার হাতে।
সার্বভৌম স্বাধীনতা
ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি গাথা।
আয়োজনের কত কাহিনি কথা
কেন্দ্রীয় নায়ক সেজে সমাধানে বুঝিয়েছ সার্থকতা।
বিদায় নয়ন জল।
জীবন্ত থাকবে অবিরল।
তোমার শূন্যতা শক্তি আর সাহস দিয়ে
পূর্ণ করবে দেশপ্রেমিক আহত হৃদয়।

যুদ্ধ শিশুর পত্র

মোহাম্মদ সেলিম রেজা

বাবা তুমি দেখতে কেমন?
তোমার রং-রূপ-গন্ধ-মেজাজ
চোখ বুজলেই আজকাল বড়ো নিঃসঙ্গ লাগে।
দিনমান বেঁচে আছো ছায়া হয়ে।
জরিনার বাবা মেলা থেকে তালপাতার বাঁশি আর বাতাসা কিনে দিয়েছে।
আমাকে বলল, 'তোমার বাবাকে গিয়ে বলো– তোমাকেও...'
জানো! মাঝে মাঝে অনেক অসুখ হয়; তখন–
দুখিনী মা সান্ত্বনা দেয়, 'তোর বাবা ওষুধ নিয়ে আসবে–
তুই ভালো হয়ে যাবি'।
জানালার চুঁইয়ে পড়া পানি দেখে প্রহর গুণি।
কে আমার বাবা? কেনই-বা বাবাহীন এই অভিশপ্ত জীবন?
একদিন মধ্য প্রহরে ভেসে ওঠে আলোকিত এক মানব।
উজ্জ্বল টকটকে সূর্যটা তবে কে ছিল?
বাবা তুমি দেখতে কেমন?
আকাশের মতোন; নাকি ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি?
বাতাসে এখনো বিস্ফোরণের গন্ধ পাই
শিরা-উপশিরায় চঞ্চল হয় একাত্তরের ইতিহাস
তর্জনী হেলিত কণ্ঠ; প্রতিধ্বনিত হয়
হৃৎপিণ্ডে। সফেদ রোদের মশাল তুমি।
ষোলো কোটি মানুষের সাথে এখন; তুমিই আমার পিতা।

যায় ওরা যাক তুমি কেন যাবে

নূরুল হক

যারা যাবার যাবে।
ওরা আসে চলে যেতে।
তুমি কেন যাবে
তুমি চলে গেলে
পৃথিবীতে ধেয়ে আসবে অবিরাম গনগনে হিমের আগুন।
তুমি চলে গেলে
পাখিরাও একে একে ভুলে যাবে মনোরম প্রভাত সংগীত
তুমি চলে গেলে
হিংসার নুনে সেদ্ধ হবে আমাদের তাবত সুকুমার কলা
কালিগঙ্গা নদে ভাসমান প্রেম নাও ডুবে যাবে অচিরাৎ
তুমি চলে গেলে
নির্বাসিত অন্তর থেকে খসে পড়বে স্মৃতির সোনালি পালক
তুমিহীন এ বিশ্বলোকে নেমে আসবে অজ্ঞতার অন্ধকার
হতাশার লাভাস্রোতে ভেসে যাবে শহর বন্দর আর জনপদ
আমার দেহে যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয় প্রত্যহ তোমার নামে
তুমি চলে গেলে
রুদ্ধ হবে তার গতি, মুহূর্তেই ঘটে যাবে প্রলয় আমার মর্ত্যধামে।

মুগ্ধ হয়ে দেখি

কাজী সুফিয়া আখতার

ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের মানচিত্র জুড়ে তোমার নিবিড় মায়া
সাড়ে ষোলো কোটি জনগণের মাথায় পড়ে তোমার মমতা ছায়া
তোমার পায়ের স্পর্শে ছলছল শব্দে-ছন্দে আজও বহে নদনদী
শ্রাবণধারার মতো অবিরল নিরবধি
গুন টানা নৌকার হাল ধরে আজও মাঝি গায় ভাটিয়ালি
ধূসর মেঘদলের সাথে চলে শাদা শাপলা ও দোয়েল পাখির মিতালি।
সতেজ বৃক্ষের প্রাণস্পন্দনে আজও কাঁপে বনভূমি
জাতির পিতা তোমার প্রিয় স্বদেশ, প্রিয় জন্মভূমি
উন্নয়নশীল দেশের মডেল আজ, আর নয় তলাবিহীন ঝুড়ি।
বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নেতাদের মাঝে আজ দীপ্তিমান বঙ্গবন্ধুকে স্মরি
১৫ই আগস্টের কুচক্রী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষরুপী কীটগুলো
ভাবতে পারেনি হিমালয়ের চেয়েও অনেক বেশি তোমার উচ্চতা
পৃথিবীর কোনো বুলেট এত শক্তিশালী নয় যে বাংলাদেশের হৃদয় থেকে
উড়িয়ে দেবে তোমার সোনালি আঙুল, ভুলিয়ে দেবে তোমার বারতা
স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের বুকে দুরন্ত বাতাসে
ওড়ে লাল-সবুজের জাতীয় পতাকা।

আমি মুজিব মাতা

পারভীন আক্তার লাভলী

আমি গর্বিত এক মাতা
আমার পুত্র খোকা-মুজিব
বাঙালি জাতির পিতা।
মাছের বন্ধু, গাছেরও বন্ধু
গরিব-দুঃখীর মিতা
আমার সেই খোকা হলো
বাঙালি জাতির পিতা।
সত্যিই আমি গর্বিত যে
আমি মুজিব মাতা।
খোকা আমার সরল ছিল
দৃঢ়চেতা মন
এমন একজন নেতা ছিল
বড়োই প্রয়োজন।
দশের ব্যথায় ব্যথী ছিল
সবার সুখেই-সুখী
আমি গর্বিত এক মাতা
বুকে আমার হিমালয়ের
চূড়াসম ব্যথা।
সবার জন্য খোকা আমার
গড়েছিল এক বজরা
কেন তবে খোকার বুকটা
করল ওরা ঝাঁঝরা?
কার আদেশে করল গুলি?
আমার খোকার বুকে!
মাতৃহৃদে শোকের অনল
জ্বলছে ধিকে ধিকে।
পুত্রহারা শোকের ব্যথা
ক'জনেই বা বোঝে?
বোঝেন যারা, তারা আমার
খোকার স্মৃতিই খোঁজে।
মধুমতির বুকে জাগে
পুত্রশোকের ঢেউ
পুত্রহারা মায়ের ব্যথা
বুঝার নাই তো কেউ।
সারা বাংলায় মিশে আছে
খোকার তেজী রক্ত
তাই তো আজ খোকার
প্রেমে লক্ষ-কোটি ভক্ত।
রাসেল সোনার বুকে ওরা
কেন করল গুলি?
কোথায় ছিল বিশ্বে সেদিন
শিশু অধিকারের বুলি?
খোকার মতোই তেজোদৃপ্ত
শেখ হাসিনার জন্য
মুজিব হত্যার বিচার পেয়ে
সবাই হলো ধন্য
পুত্রহারা জননী আমি
অন্তর আমার খোকার জন্য
আজও ফাঁকা-শূন্য।

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে রাষ্ট্রপতির পুষ্পস্তবক অর্পণ

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ১৫ই আগস্ট সকালে দেশ ও জাতির পক্ষ থেকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে ১৫ই আগস্ট ২০১৮ জাতীয় শোক দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন–পিআইডি

শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পর রাষ্ট্রপতি সেখানে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে তাঁর দেওয়া বাণীতে উল্লেখ করেন, 'আজ ১৫ই আগস্ট, জাতীয় শোক দিবস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৩তম শাহাদতবার্ষিকী। বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক বেদনাবিধুর দিন। আমি শোকাহত চিত্তে তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। জাতীয় শোক দিবসে পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।'

ভিভিআইপিদের সাথে জনসম্পৃক্ততা ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের (ভিভিআইপি) জনসম্পৃক্ততা ক্ষতিগ্রস্ত না করে পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের (পিজিআর) সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান। রাষ্ট্রপতি বলেন, 'গণমানুষের সঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। তাই সাধারণ লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন না করে ভিভিআইপিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন'। ৪ঠা জুলাই ঢাকা সেনানিবাসে ৪৩তম প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের (পিজিআর) প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

পিজিআর-এর পেশাদারি কার্যক্রমের প্রশংসা করে রাষ্ট্রপতি বলেন, নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে গভীর দেশপ্রেম, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা ও একনিষ্ঠতার কোনো বিকল্প নেই। বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতিতে ও প্রতিকূল আবহাওয়া মোকাবিলা করে এই শৃঙ্খলাবাহিনী তাদের দায়িত্ব পালন করেন'।

বিশ্বে বাংলাদেশ উন্নয়ন বিস্ময়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, বিশ্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়ন বিস্ময়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে সমুন্নত রেখে সরকার দেশের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে অসামান্য উন্নয়ন করে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ অনুসরণ করে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে যাচ্ছে। ২২শে জুলাই বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) ৫৭ বছর পূর্তি এবং হাওর ও চর উন্নয়ন ইনস্টিটিউট উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন।

দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন যুদ্ধে জয়লাভ করতে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন অপরিহার্য উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও স্থিতিশীলতা সংরক্ষণে কৃষির ভূমিকা আজও মুখ্য। বর্তমান সরকারের নিরলস প্রচেষ্টায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বৈরিতা মোকাবিলা করে খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে একটি বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে'। তিনি আরো বলেন, 'আশা করছি হাওর ও চর উন্নয়ন ইনস্টিটিউট অবহেলিত হাওর অঞ্চলের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে'।

ভেজালমুক্ত মৎস্য খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করার আহ্বান

নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন এবং রপ্তানি নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতি রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আহ্বান জানান। ২৪শে জুলাই 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১৮' পালন উপলক্ষে বঙ্গভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২২শে জুলাই ২০১৮ ময়মনসিংহে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাওর ও চর উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে মোনাজাত করেন–পিআইডি

বলেন। রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে মৎস্য খাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ খাত। এজন্য তিনি বিভিন্ন জাতের স্থানীয় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে এবং এ খাতের সার্বিক পরিস্থিতি ভালোভাবে দেখাশোনা করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ প্রদান করেন।

মাঠ প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির সংস্কৃতি চালু করতে হবে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ মাঠ প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির সংস্কৃতি চালু করতে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকদের প্রতি আহ্বান জানান। ২৫শে জুলাই বঙ্গভবনে দেশের সকল বিভাগ ও জেলার প্রশাসনিক প্রধানদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া বাদ দিয়ে জনগণের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিন। জনগণ যাতে সরকারি সেবা নিতে গিয়ে কোনো ধরনের হয়রানির শিকার না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে'।

এছাড়া কৃষি, শিক্ষা, যোগাযোগ ও অবকাঠামো খাতে সরকারের বিভিন্ন মেগা উন্নয়ন প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'জনগণের প্রতিটি টাকার যাতে সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে'।

আচরণে জনগণকে কষ্ট দেবেন না

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, পেশাদারিত্ব অর্জনে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। রাষ্ট্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রত্যেক স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের (এসএসএফ) সদস্যের নিজেকে দক্ষ, চৌকস ও যুগোপযোগী নিরাপত্তা কর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

২৮শে জুলাই বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) এসএসএফ-এর ৩২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, 'মনে রাখতে হবে, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। আপনাদের কোনো আচরণে জনগণ যেন কষ্ট না পায় সেদিকে সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে'।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সুবিধাভোগীদের ভাতা বিতরণ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই জুলাই গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচির আওতায় ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সুবিধাভোগীদের ভাতা বিতরণ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই পদ্ধতিতে উপকারভোগীদের ব্যাংক হিসাবে টাকা পৌঁছার খবর তাদের মোবাইল ফোনে চলে যাবে এবং স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সেই টাকা তুলতে পারবেন তারা। তিনি আরো বলেন, 'মানুষের সেবা করাই আমাদের কাজ, মানুষের পাশে থাকাই আমাদের কাজ। বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলব। প্রতিটি গ্রামের মানুষ শহরের মতো সুবিধা পাবে'।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৩০ লাখ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮ই জুলাই বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০১৮ এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা কর্মসূচি'র উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার সুন্দরবনের

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই জুলাই ২০১৮ গণভবনে সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচির আওতাধীন ভাতার অর্থ ইলেক্ট্রনিক (G2P) উপায়ে বিতরণ কার্যক্রম ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

জীববৈচিত্র্য রক্ষা, রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ব্রিডিং পয়েন্ট উন্নত করা এবং রয়েল বেঙ্গল টাইগার যাতে সুরক্ষিত হয় সেজন্য উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী ৩০ লাখ বীর শহিদদের স্মরণে সারা দেশে একযোগে জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৩০ লাখ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিরও উদ্‌বোধন করেন এবং দেশে প্রথমবারের মতো এ ধরনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। পরে তিনি পরিবেশ পদক ২০১৮-এর জন্য নির্বাচিত ব্যক্তি ও সংস্থা এবং বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন ২০১৮, বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০১৭ ও সামাজিক বনায়নের লভ্যাংশের চেকপ্রাপ্তদের মধ্যে পদক ও চেক বিতরণ করেন।

জনপ্রশাসন পদক ২০১৮ প্রদান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩শে জুলাই ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস ও জনপ্রশাসন পদক-২০১৮' প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী প্রশাসনের কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেন, জনগণ যাতে দুর্ভোগে না পড়েন। কারণ সরকারি চাকরি মানে দেশের কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের ট্যাক্সের পয়সায় সবার বেতন, আরাম-আয়েশ সবকিছু। এছাড়া তিনি মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা, উদ্ভাবনী শক্তি দেশ গড়ার কাজে লাগাতে কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

জেলা প্রশাসক সম্মেলনে অংশগ্রহণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪শে জুলাই তাঁর কার্যালয়ের শাপলা হলে অনুষ্ঠিত তিনদিনব্যাপী 'জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৮' উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী জেলা প্রশাসকদের জন্য ২৪টি বিশেষ নির্দেশনা দেন। তিনি জেলা প্রশাসকদের মাদক, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, পেশিশক্তি ও সন্ত্রাস নির্মূলে বিনা দ্বিধায় কাজ করার আহ্বান জানান। এছাড়া সমাজ থেকে সন্ত্রাস নির্মূলে মাদক বিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখার এবং যুবসমাজকে মাদকের হাত থেকে রক্ষা করার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন প্রধানমন্ত্রী।

বঙ্গবন্ধুর জেল জীবন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮ই জুলাই বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০১৮, জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৮- এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩০শে জুলাই তাঁর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জেল জীবনের ওপর '৩০৫৩ দিন' শীর্ষক একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন। বইটিতে বঙ্গবন্ধুর কারা জীবনের অনেক দুর্লভ ছবি ও তথ্য রয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন কারা অধিদফতরের ব্যবস্থাপনা এবং জননিরাপত্তা বিভাগের তদারকিতে বইটি প্রকাশিত হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বইটি প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন।

দুটি ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১শে জুলাই বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে দুটি ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের উদ্‌বোধন করেন। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর সেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে গাজীপুর ও বেতবুনিয়াতে ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র দুটি স্থাপন করা হয়। গ্রাউন্ড স্টেশন দুটির নামকরণ করা হয়েছে সজীব ওয়াজেদ ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র গাজীপুর এবং সজীব ওয়াজেদ ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র বেতবুনিয়া।

আন্ডারপাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ই আগস্ট নিরাপদ সড়কের দাবিতে বিমানবন্দর সড়কের কুর্মিটোলায় শহিদ রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের কাছে আন্ডারপাস নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে প্রধানমন্ত্রী যানবাহন নিয়ন্ত্রণে সব সড়কে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন ও ডিজিটাল নম্বর প্লেট ব্যবহার নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এর মাধ্যমে লেজার সিগন্যাল দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে অনিয়ম শনাক্ত করা যাবে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

২২শে জুলাই ২০১৮ ঢাকা সেনানিবাসে 'সেনাসদর নির্বাচনি পর্ষদ ২০১৮'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা–পিআইডি

সেনাবাহিনীর অফিসারদের দক্ষ এবং দেশপ্রেমিক নেতৃত্বের ওপর আস্থাশীল হওয়ার নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২শে জুলাই ঢাকা সেনানিবাসে 'সেনাসদর নির্বাচনি পর্ষদ ২০১৮' আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসারদের দেশের গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক ধারা অব্যাহত রেখে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় যোগ্য, দক্ষ এবং দেশপ্রেমিক নেতৃত্বের ওপর আস্থাশীল হওয়ার নির্দেশ দেন। এছাড়া একটি সুশৃঙ্খল এবং শক্তিশালী সেনাবাহিনী দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সুসংহতকরণে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

বাড্ডা ইউলুপ উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮শে জুলাই হাতিরঝিল নর্থ ইউলুপ উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনের পর তা জনগণের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এতে হাতিরঝিল থেকে সহজেই রামপুরা-বনশ্রী হয়ে মালিবাগের দিকে যাওয়া যাবে। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী ঢাকা শহরকে ঘিরে একটি এলিভেটেড রিং রোড নির্মাণ করার, বহুতল বিল্ডিং দিয়ে ঢাকার আশপাশে ছোটো ছোটো শহর গড়ে তোলার এবং মাত্র ১ ঘণ্টায় ট্রেনে যেন ঢাকা টু চট্টগ্রাম, ঢাকা টু সিলেট, ঢাকা টু রাজশাহী, ঢাকা টু দিনাজপুর, ঢাকা টু বরিশাল এমনকি ঢাকা টু কলকাতা চালু করার আশ্বাস দেন।

দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা আগস্ট রাজধানীর একটি হোটেলে ঢাকা ওয়াসার দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী ঢাকা মহানগরীর আধুনিকায়নে সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, রাজধানীতে কোনো বস্তি থাকবে না। বস্তিগুলো বহুতল ভবনে প্রতিস্থাপিত হবে, যাতে নগরবাসী উন্নত স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে জীবনযাপন করতে পারে।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

তথ্য মন্ত্রণালয় : বিশেষ প্রতিবেদন

বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে গণগ্রন্থাগারের শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ও গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের যৌথ আয়োজনে বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র ও আলোকচিত্রের দুদিনব্যাপী প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেনের সভাপতিত্বে সংস্কৃতি

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১৫ই আগস্ট ২০১৮ শাহবাগে গণগ্রন্থাগারের শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জীবন ও কর্মের ওপর আলোকচিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নাসির উদ্দিন আহমেদ ও প্রধান তথ্য অফিসার কামরুন নাহার অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেন, এই প্রামাণ্যচিত্র ও আলোকচিত্রগুলো সাক্ষী দিচ্ছে বঙ্গবন্ধু আমাদের জাতির পিতা, বাংলাদেশের স্থপতি ও জাতিসত্তার নির্মাতা।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক হৃদযন্ত্র সম্মেলন

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ২২শে জুলাই সোনারগাঁও হোটেলে ইউনিভার্সাল কার্ডিয়াক হসপিটাল আয়োজিত ২য় আন্তর্জাতিক হৃদযন্ত্র (কার্ডিয়োকেয়ার) সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনে তথ্যমন্ত্রী বলেন, চার হাজার বছরের সভ্যতাসমৃদ্ধ এদেশের হৃদয়ে জোর করে জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার ব্লক চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শেখ হাসিনা তা দক্ষ সার্জনের মতোই সরাচ্ছেন। এসময় নিজের হৃদরোগের চিকিৎসার ওপর আলোকপাত করে এদেশের চিকিৎসকদের ওপর তার শতভাগ আস্থার কথা বলেন তথ্যমন্ত্রী।

নারীর শত্রু নির্মূলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু নারীর শত্রু নির্মূলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ২৯শে জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবন মিলনায়তনে ইউএনডিপি'র সহায়তায় 'সেন্টার ফর মেন অ্যান্ড মাসকুলিনিটিজ স্টাডিজ' আয়োজিত 'তরুণ সমাজে নারী-পুরুষ সহিংসতারোধ' নীতিনির্ধারণী সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ আহ্বান জানান।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, লিঙ্গ বৈষম্য থেকে বেরিয়ে আসতে শুধু নারীকে নয়, সচেতনভাবে এগিয়ে আসতে হবে পুরুষকে।

এছাড়া তিনি গণতন্ত্র, গণমাধ্যম ও সাইবার জগতের বিকাশের সাথে খাপ খাওয়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, বিকাশমান এই তিন প্রপঞ্চের সাথে তাল মিলাতে নারী-পুরুষ বৈষম্য ও লিঙ্গ সহিংসতা দূর করার কোনো বিকল্প নেই।

মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ

সংবিধান, মুক্তিযুদ্ধ, জাতির পিতা ও গণতন্ত্রের আদর্শ কোনো দলীয় পথ নয়, সার্বজনীন নাগরিকের পথ। ২৫শে জুলাই এ বছরের জেলা প্রশাসক সম্মেলনে এক মতবিনিময় সভায় একথা জানান তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। এছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান ও চলতি অর্থ বছরের বাজেট বাস্তবায়নে কোনো গাফিলতি করা চলবে না উল্লেখ করে জেলা প্রশাসকদের বলেন, নির্বাচন একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া, এটি সুষ্ঠুভাবে করা আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু এ অজুহাতে বাজেট বাস্তবায়নে কোনো গাফিলতির সুযোগ নেই। উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।

তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম ১৬ই আগস্ট ২০১৮ শাহবাগে গণগ্রন্থাগারের শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনে জাতির পিতার জীবন ও কর্মের ওপর প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী উপভোগ করেন–পিআইডি

বঙ্গবন্ধু তাঁর আদর্শ ও কর্মের মাধ্যমে চিরকাল বেঁচে থাকবেন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর আদর্শ ও কর্মের মাধ্যমে চিরকাল বেঁচে থাকবেন। যাঁরা মানুষের জন্য কাজ করেন তাঁরা কখনও হারিয়ে যান না। ১৬ই আগস্ট গণগ্রন্থাগারের শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর এবং গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জীবন ও কর্মের ওপর প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম। সভায় তথ্য প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত স্বাধীনতা বিরোধী চক্র '৭৫-এর ১৫ই আগস্টের পর থেকেই হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করে। তারা ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারি করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হত্যার বিচারের পথও বন্ধ করে দেয়। মার্শাল ল' জারির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করে। সংবিধানকে ক্ষতবিক্ষত করে।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে প্রধান তথ্য কর্মকর্তা কামরুন নাহার, পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর বক্তৃতা করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ শীর্ষক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ

দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৪ই আগস্ট পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন তথ্য সচিব আবদুল মালেক। সভায় তথ্য সচিব আরো বলেন, বাংলাদেশ আজ বিশ্বের উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী দেশকে উন্নয়নের শীর্ষে পৌঁছাতে যেসব কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন এরমধ্যে ১০টি বিশেষ উদ্যোগ অন্যতম।

সভা শেষে তথ্য সচিব মির্জাগঞ্জ উপজেলা চত্বরে নির্মিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ম্যুরাল উন্মোচন, পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং মোনাজাত করেন।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস

১লা জুলাই: দেশের সব সামাজিক ও নৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামে আলোকবর্তিকা খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়।

শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ

২রা জুলাই: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তাঁর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকারখানার শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি শতভাগ বাড়িয়ে ৮ হাজার ৩০০ টাকা করার অনুমোদন দেওয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩রা জুলাই ২০১৮ শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর সভায় সভাপতিত্ব করেন–পিআইডি

একনেক বৈঠক

৩রা জুলাই: এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় দেশের আরো ১৬ জেলায় আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণের উদ্যোগ প্রকল্পসহ মোট ৮ প্রকল্প অনুমোদিত হয়।

আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস

৭ই জুলাই: বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'পণ্য এবং সেবার টেকসই উৎপাদন ও ব্যবহার'।

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার

৮ই জুলাই: বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৬ প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠানে ২৬ ক্যাটাগরিতে ২৯ জন শিল্পীকে পুরস্কৃত করা হয়।

মন্ত্রিসভায় জাতীয় কৃষিনীতি অনুমোদন

৯ই জুলাই: সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে দেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য কৃষিকে নিরাপদ ও লাভজনক করে তুলতে ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহার করার বিধান রেখে 'জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৮'-এর খসড়া অনুমোদিত হয়। এছাড়া মন্ত্রিসভায় বাংলাদেশ 'শিশু একাডেমি আইন ২০১৮'- এর খসড়াও অনুমোদন দেওয়া হয়।

একনেকে ২৯২০ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন

১০ই জুলাই: এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে মোট ২ হাজার ৯২০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬ প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস

১১ই জুলাই: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা, র‍্যালি, সেমিনার ও সভাসহ বিভিন্ন আয়োজনে পালিত হয় 'বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস'।

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন

১৪ই জুলাই: সারাদেশে জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন পালন করা হয়। ক্যাম্পেইনের আওতায় এ বছর সারাদেশে ২ কোটি ১৯ লাখ শিশুকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

মানসিক স্বাস্থ্য আইন অনুমোদন

১৬ই জুলাই: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তাঁর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে 'মানসিক স্বাস্থ্য আইন ২০১৮' এবং 'জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা ২০১৮'-এর খসড়া অনুমোদিত হয়।

বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষমেলা

'সবুজে বাঁচি, সবুজ বাঁচাই, নগর-প্রাণ-প্রকৃতি সাজাই' প্রতিপাদ্য নিয়ে জাতীয় বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

এইচএসসি'র ফল প্রকাশ

১৯শে জুলাই: চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। পাসের হার ৬৬.৬৪।

জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস

২৩শে জুলাই: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'জাতীয় পাবলিক সার্ভিস' দিবস।

প্রতিবেদন: আখতার শাহীমা হক

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে জাতিসংঘে সংবাদ সম্মেলন

রাখাইন থেকে রোহিঙ্গাদের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করার এক বছর পুর্তি হয় ২৫শে আগস্ট। এ উপলক্ষে জাতিসংঘে (২৮শে আগস্ট) স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির বরাত দিয়ে বাসস জানায়, যুক্তরাজ্যের কমনওয়েলথ ও জাতিসংঘ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী লর্ড তারিক মাহমুদ আহমাদের সভাপতিত্বে উন্মুক্ত এ সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তেনিও গুতেরেস, ইউএনডিপি'র অ্যাসোসিয়েট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তেগেগনিঅর্ক গেট্টু এবং ইউএনএইচসিআর-এর শুভেচ্ছাদূত অভিনেত্রী কেইট ব্লানশেট। নিরাপত্তা পরিষদের ১৫টি সদস্য রাষ্ট্রের বাইরে এ সভায় বাংলাদেশ ও মিয়ানমার প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন।

সংবাদ সম্মেলনে জাতিসংঘ মহাসচিব বলেন, 'এরই মধ্যে এক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এ সমস্যা অনির্দিষ্টকাল চলতে পারে না'। তিনি কফি আনান কমিশনের সুপারিশমালার পূর্ণ বাস্তবায়নের কথা পুনরুল্লেখ করে জাতিসংঘ এবং এর বিভিন্ন সংস্থাকে রাখাইন প্রদেশে বাধাহীন প্রবেশাধিকার দেওয়ার জন্য মিয়ানমারের প্রতি আহ্বান জানান। ইউএনএইচসিআর-এর শুভেচ্ছাদূত কেইট ব্লানশেট বলেন, রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে নিরাপত্তা পরিষদকেই দায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতভেদের উর্ধ্বে উঠে নিরাপত্তা পরিষদের সব সদস্যকে কাজ করার আহ্বান জানান ব্লানশেট। মার্চে বাংলাদেশ সফরকালে তিনি কক্সবাজারের বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়ে রোহিঙ্গাদের সঙ্গে কথা বলেন। জাতিসংঘের উন্মুক্ত

আলোচনায় তিনি সে অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন গত এক বছর ধরে রোহিঙ্গা ইস্যুটি সামনে রেখে এর সমাধানে কাজ করে যাওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি ধন্যবাদ জানান। রাষ্ট্রদূত মাসুদ গত বছর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উত্থাপিত পাঁচ দফা সুপারিশের কথা উল্লেখ করে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এ সুপারিশমালার ভিত্তিতেই রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান হতে পারে।

এর আগে ২৭শে আগস্ট রোহিঙ্গা গণহত্যা নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে জাতিসংঘ। নির্যাতনের শিকার রোহিঙ্গাদের সাক্ষাৎকার, প্রত্যক্ষদর্শী, ভিডিও ফুটেজ ও স্যাটেলাইট ছবি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে করা এই প্রতিবেদনে রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন, ধর্ষণ, হত্যা ও বাস্তুচ্যুতির দায়ে মিয়ানমারের সেনাপ্রধানসহ ৬ জনকে অভিযুক্ত করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এ প্রতিবেদনকে স্বাগত জানানো হলেও মিয়ানমার তা প্রত্যাখ্যান করেছে। জাতিসংঘের ওই প্রতিবেদনে মিয়ানমারের নেত্রী অং সান সু চি'র কঠোর সমালোচনা করা হয়।

৯ই আগস্ট ২০১৮ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎকালে কমনওয়েলথ মহাসচিব প্যাট্রিসিয়া স্কটল্যান্ড চার্টার অব কমনওয়েলথ-এর কপি প্রদান করেন–পিআইডি

কমনওয়েলথ মহাসচিবের বাংলাদেশ সফর

কমনওয়েলথ মহাসচিব প্যাট্রিসিয়া স্কটল্যান্ড তিন দিনের সফরে ৮ই আগস্ট বাংলাদেশে আসেন। সফরকালে ৯ই আগসট তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তাঁর তেজগাঁও কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে বর্তমান সরকার দেশে গণতন্ত্র সুসংহত ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত করতে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৈঠকে সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার সফলভাবে এই সামাজিক ব্যাধি মোকাবিলা করছে। তিনি আরো বলেন, আমরা সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে নিয়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছি। আমাদের সন্তানেরা যাতে সন্ত্রাসবাদের দিকে ঝুঁকে না পড়ে, সেদিকেও লক্ষ রাখছি। এছাড়া স্থানীয় জনগণের আবাদি জমিতে মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার ফলে তাদের অবর্ণনীয় দুর্ভোগের কথা এবং বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনে উদ্বেগের বিষয় উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জবাবে কমনওয়েলথ মহাসচিব বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে আশ্রয় দিয়ে মহান মানবতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন। প্যাট্রিসিয়া স্কটল্যান্ড কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটানোর আহ্বান জানান। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এছাড়া সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় বাংলাদেশের ভূমিকারও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তিনি একটি কমনওয়েলথ ক্রিকেট ক্লাব গঠনের পাশাপাশি কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে জনপ্রিয় এই খেলাটির উন্নয়নে কমনওয়েলথ ক্রিকেট লিগ চালুর বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেন।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

মাদকাসক্তরা চাকরি পাবে না

বর্তমান সরকার মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন রোধে যে-কোনো পদক্ষেপ গ্রহণে বদ্ধপরিকর। এরই আওতায় এবার সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সময় মাদকাসক্তি পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অ্যাকশন প্ল্যান থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধাস্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরির ক্ষেত্রে ডোপ টেস্ট (মাদক পরীক্ষা) করতে হবে। যারা ফিটনেস পরীক্ষার ফলাফলে নেতিবাচক হবেন তারা চাকরির জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। বিশেষ করে সরকারি চাকরিতে যোগ দেওয়ার আগে সব প্রার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় ডোপ টেস্ট করা হবে। যদি কেউ মাদক নেয় ডোপ টেস্টে সেটা ধরা পড়বে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কার্গো ব্যবস্থাপনায় সাফল্য

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের রপ্তানি কার্গো ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ যুক্তরাজ্যের ক্যাটাগরি-১ সনদ অর্জন করেছে। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) বাংলাদেশকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য এভিয়েশন নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় চুক্তির আওতায় ২০১৭ সালের নভেম্বরে একটি যৌথ সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। এই সমীক্ষার মান সন্তোষজনক হওয়ায় বাংলাদেশ থেকে সরাসরি যুক্তরাজ্যে কার্গো পরিবহণে নিষেধাজ্ঞা চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রত্যাহার করা হয়। এরপর এপ্রিল ও জুলাইয়ে আরো দুটি যৌথ সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। এতেও বাংলাদেশ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সন্তোষজনক মান ধরে রাখে।

সৌরবিদ্যুৎ কিনবে সরকার

গ্রাহকের বাড়ি, অফিসের আঙিনায় বা ছাদে স্থাপিত সৌর প্যানেল থেকে বিদ্যুৎ নেবে সরকার। নেট মিটারিং সিস্টেম নামে নতুন পদ্ধতিতে এ বিদ্যুৎ সংগ্রহ করবে সরকার। এ পদ্ধতিতে গ্রাহক তার আঙিনায়-ছাদে সৌর প্যানেল স্থাপন করবে। দিনের বেলায় ব্যবহারের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ গ্রিডে সরবরাহ করা হবে। মাস শেষে গ্রাহকের বিদ্যুতের বিলের সঙ্গে যা সমন্বয় হয়ে যাবে। এটিকে বিদ্যুৎ ব্যাংকও বলা যেতে পারে। এর ফলে বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিলেরও সাশ্রয় হবে। ২৮শে জুলাই এক সেমিনারে এ তথ্য জানানো হয়। আগামী দুই মাসের মধ্যে অন্তত ২০০ গ্রাহকের আঙিনায় নতুন এ পদ্ধতি চালুর নির্দেশ দিয়েছে জ্বালানি উপদেষ্টা। পাঁচ বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানির প্রত্যেকটিকে ২০টি করে নেট মনিটরিং গ্রাহক তৈরির লক্ষ্য বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

পণ্য ছয় মাসের বেশি গুদামে থাকবে না

সরকারি কারখানায় উৎপাদিত পণ্য ছয় মাসের বেশি সময় গুদামে ফেলে রাখা যাবে না। পণ্য বিক্রিতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এ নির্দেশ শিল্প মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

সরকারি কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি বিএসটিআইয়ের মানদণ্ড অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন, বর্জ্য শোধনাগার বাধ্যতামূলকসহ বয়লার নির্মাণেরও নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া সরকারি কারখানা বেসরকারি খাতে না দেওয়া, পণ্য বিক্রি বৃদ্ধিতে কার্যকর পদক্ষেপ, বন্ধ কারখানা চালু, মুনাফা বৃদ্ধিতে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এ চিঠিতে।

সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি

শিক্ষা খাতে যুগান্তকারী পরিবর্তন হয়েছে গত ১০ বছরে। প্রাথমিকে শতভাগ ভর্তি, ঝরে পড়া হ্রাস, জেন্ডার সমতা, এক কোটি ৩০ লাখ শিশু উপবৃত্তি, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণসহ সরকারের কার্যকর পদক্ষেপের কারণে সাক্ষরতার হার বর্তমানে ৭৩ শতাংশ– শিক্ষা অবকাঠামোতে যা বিপ্লবের শামিল। শিক্ষা খাতে এত উন্নতির কারণেই সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

কলরেট আগের চেয়ে কম

মোবাইল ফোনে কল করার সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছে সরকার। এখন থেকে ৫০ পয়সায় মোবাইল ফোনে কল যাবে। এক অপারেটর থেকে অন্য অপারেটরে ফোন কলের খরচ কমবে। তবে এতে একই অপারেটরের কোনো গ্রাহককে ফোন করলে খরচ বাড়বে। ১লা আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের সভাপতিত্বে এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বর্তমানে একই অপারেটর (অননেট) কল করার সর্বনিম্ন মূল্য ২৫ পয়সা আর অন্য অপারেটর (অফনেট) কল করার সর্বনিম্ন মূল্য ৬০ পয়সা। নতুন কলরেট চালু হওয়ায় অননেট ও অফনেটের এই পার্থক্য আর থাকবে না। সব অপারেটরে কথা বলার সর্বনিম্ন মূল্য হবে ৫০ পয়সা।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

৫-জি চালু হওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, স্মার্টফোন নির্মাতা হুয়াওয়ে ও রবি'র সহযোগিতায় বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ৫-জি প্রযুক্তি চালু করতে যাচ্ছে সরকার। ২৫শে জুলাই রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজন করা হয় 'বাংলাদেশ ৫-জি সামিট ২০১৮'। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সজীব ওয়াজেদ জয় এ তথ্য জানান।

অনুষ্ঠানে জয় জানান, বাংলাদেশ বিশ্বে ৫-জি চালু করা প্রথম দেশগুলোর মধ্যে একটি হতে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতাহার অনুযায়ী, ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং ভিশন-২০২১-এর লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। সরকার ইন্টারনেটের খরচ কমাতে রেগুলেটরি বডির ওপর চাপ দেওয়ার কারণেই বাংলাদেশ আজ বিশ্বের সবচেয়ে কম দামে ইন্টারনেট সুবিধা পাওয়া অন্যতম দেশ হতে পেরেছে।

ই-পাসপোর্ট চালু করার জন্য বাংলাদেশ ও জার্মানির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা জোরদার এবং ভুয়া পাসপোর্ট ও জালিয়াতি প্রতিরোধে ই-পাসপোর্ট (ইলেকট্রিক পাসপোর্ট) চালু করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও জার্মানির মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ১৯শে জুলাই বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র (বিআইসিসি) তে ই-পাসপোর্ট প্রবর্তন ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার কন্ট্রোল ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান খান কামাল উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন জার্মানির পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নেইলস আনেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন থেমে নেই। এ পর্যন্ত বাংলাদেশি নাগরিকদের ২ কোটিরও বেশি মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট দেওয়া হয়েছে এবং বিদেশিদের ভ্রমণের জন্য ১১ লাখেরও বেশি মেশিন রিডেবল ভিসা দেওয়া হয়েছে। তবে এমআরপি পাসপোর্ট এখনই বন্ধ হয়ে যাবে না। ই-পাসপোর্ট সম্পূর্ণরূপে চালু হওয়ার আগ পর্যন্ত এটি চালু থাকবে।

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় ২৫শে জুলাই ২০১৮ হোটেল সোনারগাঁওয়ে Bangladesh 5G Summit 2018 অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

২২শে জুলাই বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)-এর সম্মেলন কক্ষে ইউএনডেসা প্রকাশিত জরিপ রিপোর্টের ওপর এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।

সম্মেলনে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার জানান, শেখ হাসিনার সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নানা উদ্যোগ গ্রহণের ফলে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল সরকার ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ দিন দিন অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

দেশের ১২শ ইউনিয়নে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে

রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৩রা আগস্ট মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের যৌথ আয়োজনে 'জেলা প্রশাসকদের জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও মাঠ প্রশাসনের করণীয় নির্ধারণ করাই ছিল এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য। কর্মশালার সমাপন অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার বলেছেন, 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' তথা তথ্য ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে জেলা প্রশাসকগণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতোমধ্যে ১২শ ইউনিয়নে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ইন্টারনেট সংযোগ সংশ্লিষ্ট যে-কোনো সমস্যায় তার সাথে যোগাযোগ করার জন্য জেলা প্রশাসকদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

সূচনা অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে জুনাইদ আহমেদ পলকের বক্তব্য থেকে জানা যায়, ডিজিটাল সেবার ফলে দেশের সব শ্রেণি-পেশার মানুষ ২৪ ঘণ্টা সেবা পাচ্ছেন। তিনি জেলা প্রশাসকদের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অগ্রসৈনিক' বলে অভিহিত করেন।

বর্তমান সরকার দেশের প্রতিটি বাড়িতে ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। ইতোমধ্যে ২ হাজার ৬০০ ইউনিয়নে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দেওয়ার কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে বলেও অনুষ্ঠানে জানানো হয়।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের ই-গভর্নমেন্ট র‍্যাংকিংয়ে ১১৫তম

বাংলাদেশ জাতিসংঘের ই-গভর্নমেন্ট জরিপে ১৫০তম স্থান থেকে ১১৫তম অবস্থানে উঠে এসেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিগত ৬ বছরে ব্যাপক উন্নয়নের ফলে এ অবস্থান। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক বিভাগ (ইউএনডেসা) পরিচালিত ই-সরকার ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স (ইজিডিআই) অনুযায়ী বাংলাদেশ ০.৪৭৬৩ পয়েন্ট পেয়ে ১৯৩টি দেশের মধ্যে ১১৫তম স্থানে জায়গা করে নিয়েছে।

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতীয় রপ্তানি পুরস্কার পেল ৬৩ প্রতিষ্ঠান

পণ্য রপ্তানিতে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি পেয়েছে ৬৩ প্রতিষ্ঠান। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এ ট্রফি দেওয়া হয়েছে। ১৫ই জুলাই রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বিজয়ীদের হাতে ট্রফি তুলে দেন।

সর্বোচ্চ রপ্তানি আয়ের ভিত্তিতে এ বছর সেরা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের পুরস্কার পেয়েছে জাবের অ্যান্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড।

তৈরি পোশাক (ওভেন) খাতে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ ট্রফি পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো হলো যথাক্রমে– একেএম নিটওয়্যার লিমিটেড, রিফাত গার্মেন্ট লিমিটেড ও অনন্ত অ্যাপারেলস লিমিটেড। তৈরি পোশাক (নিটওয়্যার) খাতের স্বর্ণপদক পেয়েছে ফকির নিটওয়্যারস লিমিটেড। এ খাতে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ ট্রফি পেয়েছে যথাক্রমে–জিএমএস কম্পোজিট নিটিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ও স্কয়ার ফ্যাশন লিমিটেড। সুতা খাতে স্বর্ণ ট্রফি পেয়েছে কামাল ইয়ার্ন লিমিটেড। রৌপ্য ট্রফি পেয়েছে বাদশা টেক্সটাইল লিমিটেড আর ব্রোঞ্জ ট্রফি পেয়েছে সুফিয়া কটন মিলস লিমিটেড। টেক্সটাইল ফেব্রিক্স খাতে স্বর্ণ ট্রফি পেয়েছে এনভয় টেক্সটাইল লিমিটেড। রৌপ্য ট্রফি পেয়েছে প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল ও ব্রোঞ্জ ট্রফি পেয়েছে হামজা টেক্সটাইল।

হোম ও বিশেষায়িত টেক্সটাইল পণ্য খাতে স্বর্ণ ও রৌপ্য ট্রফি পেয়েছে যথাক্রমে জাবের অ্যান্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড ও এসিএস টেক্সটাইল লিমিটেড। টোরিটাওয়েল খাতে স্বর্ণ ট্রফি পেয়েছে নোমান টোরিটাওয়েল লিমিটেড এবং অন্যান্য খাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ৬৩ প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশ বিজনেস অ্যাওয়ার্ড পেলেন চার ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান

ঢাকা এসিআই গ্রুপের চেয়ারম্যান এম আনিস উদ দৌলাকে পুরস্কৃত করেছে আন্তর্জাতিক লজিস্টিক প্রতিষ্ঠান ডিএইচএল ও ইংরেজি দৈনিক *দ্য ডেইলি স্টার*। বাংলাদেশ বিজনেস অ্যাওয়ার্ড নামের এ

পুরস্কার ২৭শে জুলাই একটি হোটেলে প্রদান করা হয়। বছরের সেরা ব্যবসায়ী ব্যক্তিত্ব শ্রেণিতে পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

এছাড়াও আরো তিন শ্রেণিতে পুরস্কার দেওয়া হয়। বিজনেস অ্যাওয়ার্ড নামের এবারের আয়োজনটি ১৭তম। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। ব্যবসায় অসাধারণ নারী হিসেবে এ বছর সেরা নারী উদ্যোক্তার পুরস্কার পেয়েছেন পোশাক ও পাট খাতের প্রতিষ্ঠান এসিক্সের কর্ণধার আফসানা আসিফ। বছরের সেরা আর্থিক প্রতিষ্ঠান শ্রেণিতে পুরস্কার পেয়েছে পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড। আর এ বছরের সেরা ব্যবসায় উদ্যোক্তা শ্রেণিতে পুরস্কার পেয়েছে ওষুধ খাতের প্রতিষ্ঠান রেনেটা লিমিটেড।

বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ ১৫ই জুলাই ২০১৮ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ রপ্তানিকারকদের মধ্যে ট্রফি বিতরণ করেন–পিআইডি

মক্কায় যাচ্ছে দেশে তৈরি আইওটি যন্ত্র

বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি থেকে প্রথমবারের মতো দেশে উৎপাদিত ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি) পণ্য রপ্তানি শুরু হয়েছে। পানির স্তর মাপার ইন্টারনেটনির্ভর যন্ত্রটি সৌদি আরবের মক্কায় রপ্তানি হচ্ছে। পানির ট্যাংকে পানির পরিমাণ ও তাতে যে-কোনো পরিবর্তন হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যাপের মাধ্যমে স্মার্টফোনে সংকেত জানাবে এই যন্ত্র। মক্কাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'স্যাক আল ভাতানিয়া' এই যন্ত্রগুলো কিনছে। শুরুতে পাঁচ হাজার যন্ত্র রপ্তানি করা হবে।

৩১শে জুলাই গাজীপুরের কালিয়াকৈরের বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটিতে ডেটাসফটের কার্যালয়ে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার এর উদ্‌বোধন করেন।

পোশাক রপ্তানিতে হিস্যা বেড়েছে বাংলাদেশের

বিশ্ববাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের হিস্যা বা অংশ বেড়েছে। একই সঙ্গে পোশাক রপ্তানিতে একক দেশ হিসেবে চীনের পর দ্বিতীয় শীর্ষ স্থানটি ধরে রেখেছে বাংলাদেশ।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিওটিও) 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড স্ট্যাটিসটিকস রিভিউ ২০১৮' শীর্ষক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৭ সালে বাংলাদেশ ২ হাজার ৯২১ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে, যা আগের বছরের চেয়ে ২ শতাংশ বেশি। এতে বিশ্ববাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের হিস্যা দাঁড়ায় সাড়ে ৬ শতাংশ। অর্থাৎ গত বছর বিশ্বের মোট পোশাক রপ্তানির ১০০ ভাগের মধ্যে ৬ দশমিক ৫ ভাগ গেছে বাংলাদেশ থেকে। ২০১৬ সালে বাংলাদেশের হিস্যা ছিল ৬ দশমিক ৪০ শতাংশ। চার বছর ধরে বাংলাদেশের হিস্যা ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রধানমন্ত্রী পদক প্রদান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে জুলাই তাঁর কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের 'প্রধানমন্ত্রী পদক' প্রদান করেন। পদক প্রদানকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমরা যে স্বীকৃতি পেয়েছি তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। তিনি শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় আরো মনোযোগী হওয়ার এবং পিছিয়ে না পড়া, স্বাধীন জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে চলার ও বিজয়ী জাতি হিসেবে কারো কাছে হাত পেতে না চলার আহ্বান জানান। পরে প্রধানমন্ত্রী ১৬৩ জন শিক্ষার্থীকে পদক প্রদান করেন।

নারীদের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গার্লস গাইড খোলার নির্দেশ

দেশব্যাপী গার্ল গাইডস-এর কর্মকাণ্ড আরো জোরদার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নারীদের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গার্ল গাইডস-এর শাখা খোলার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২৯শে জুলাই গণভবনে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশনের জাতীয় কার্যালয় বেইলি রোডস্থ ১০তলা ভবন, বাংলাদেশ স্কাউটস-এর শতাব্দী ভবনসহ অন্যান্য প্রকল্পের উন্নয়ন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। পরে তিনি দেশের ১২টি অঞ্চলের কাব স্কাউটদের মাঝে 'শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করেন এবং ব্যাজ পরিয়ে দেন।

সেবার মনোভাব ও শিক্ষায় অবদান রাখার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ৩০শে জুলাই বসুন্ধরা কনভেনশন সিটিতে প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটির তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ব্যবসা ও মুনাফার চিন্তা ত্যাগ করে জনকল্যাণ, সেবার মনোভাব ও শিক্ষার জন্য অবদান রাখার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দেশের বাস্তবতা ও জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও টিউশন ফি একটি সীমা পর্যন্ত নির্ধারিত রাখতেও অনুরোধ জানান তিনি।

মেডিক্যাল কলেজে বাড়ল ৫০০ আসন

দেশের সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোতে ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তিতে ৫০০ আসন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ৮ই আগস্ট স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মেডিক্যাল শিক্ষা বিষয়ক সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ড, সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোর বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা এবং হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বিবেচনা করে গুণগতমানের চিকিৎসা শিক্ষা এবং উপজেলা

ও ইউনিয়ন পর্যায়ে জনগণের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে সরকার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সরকারি হলো আরো ২৭১টি কলেজ

সরকারের শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নের অংশ হিসেবে দেশের আরো ২৭১টি কলেজ সরকারি করার আদেশ জারি করা হয়। ৯ই আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর চূড়ান্ত অনুমোদনের পর ১২ই আগস্ট এ আদেশ জারি করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের উপসচিবের স্বাক্ষরে এ আদেশ জারি করা হয়।

দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার্সের মর্যাদা

কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ সনদকে সাধারণ শিক্ষার স্নাতকোত্তর ডিগ্রির স্বীকৃতি দিতে কওমি মাদ্রাসাসমূহের দাওরায়ে হাদিস-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ১৩ই আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়।

প্রতিবেদন: মো. সেলিম

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে জুলাই ২০১৮ তাঁর কার্যালয়ে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী শিক্ষার্থীদের মাঝে 'প্রধানমন্ত্রী পদক ২০১৭' প্রদান করেন–পিআইডি

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাদেশ

কৃষি ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে এক অনন্য মর্যাদায় স্থান দিয়েছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। এসব সম্ভব হয়েছে শুধু বর্তমান সরকারের কৃষি উন্নয়নে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে। সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণেই দেশ আজ দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ১৫ই জুলাই রাজধানীর গাবতলীতে বিএডিসি আয়োজিত বীজ আলু হিমাগার, সেন্ট্রাল টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি ও গ্রিন হাউসের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা জানান কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী।

মন্ত্রী বলেন, বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ, সহজ শর্তে কৃষি ঋণের সুযোগ বৃদ্ধি, কৃষি যান্ত্রিকীকরণে শতকরা ৫০ থেকে ৭০ ভাগ উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকের কাছে কৃষি যন্ত্রপাতি অত্যন্ত সুলভ মূল্যে সহজলভ্য করা, ই-কৃষির সম্প্রসারণ, বিভিন্ন ফসলের উন্নত জাত ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণায় সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদানসহ সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণেই দেশ আজ দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী ২৯শে জুলাই ২০১৮ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের অডিটোরিয়ামে 'Promoting Pulses, Oilseeds, Maize and other Crops in the Stress Prone Areas of Bangladesh in Partnership with Australia' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন–পিআইডি

ধারাবাহিক উৎপাদন বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে কৃষিমন্ত্রী বলেন, আমাদের ধান, আলু, শাকসবজি উৎপাদনে বিরাট সফলতা অর্জিত হয়েছে এবং ভুট্টা, ডাল, তেল ও মসলার উল্লেখযোগ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ এখন চাল উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ, শাকসবজি উৎপাদনে তৃতীয়, পাট উৎপাদনে দ্বিতীয় ও কাঁচাপাট রপ্তানিতে প্রথম, আলু ও পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম, আম উৎপাদনে সপ্তম। ভাসমান পদ্ধতিতে চাষাবাদ বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিভিন্ন ফসলের জলবায়ু সহনশীল জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। জৈব প্রযুক্তি গবেষণায় সরকারের ইতিবাচক নীতির ফলস্বরূপ বিটি বেগুন উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ মাইলফলক তৈরি করেছে। পাটের জিনোম রহস্য আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এর ধারাবাহিকতায় কাঙ্ক্ষিত পাটের জাত তৈরির পথ সুগম হয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে শামিলের লক্ষ্য নিয়ে বর্তমান সরকার রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে বলেও জানান তিনি।

কৃষিতে প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটানোর আহ্বান

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানসম্মত ধারণার আলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি বিবেচনা করে দেশের উত্তর-দক্ষিণাঞ্চলের পানি, মাটির পুষ্টি ব্যবস্থাপনা, শস্য নিবিড়করণ এবং যান্ত্রিকীকরণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটানোর আহ্বান জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী। ২৯শে জুলাই রাজধানীর ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) অডিটোরিয়ামে 'বাংলাদেশের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ডাল, তৈলবীজ, ভুট্টা এবং অন্যান্য ফসলের আবাদ বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা জানান তিনি।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ) এবং অস্ট্রেলিয়ান সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (এসিআইএআর)-এর যৌথ গবেষণা কার্যক্রমে দেশের টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের প্রয়োজনীয় উপায় খুঁজে পাওয়া যাবে। এছাড়া খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাকে অধিকতর সুসংহত করতে গবেষণার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। এসময় তিনি খরা এবং লবণসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবনে আরো গুরুত্ব দেওয়ারও আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের অপর বিশেষ অতিথি বাংলাদেশে নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনার মিস জুলিয়া নিবলেট এসিআইএআর-এর বিভিন্ন কর্মকৌশল ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন এবং বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন খুব দ্রুত হচ্ছে। এর পেছনে ইতিবাচক কিছু লক্ষ্য রয়েছে এই দেশটির। কৃষি খাতের উন্নয়নে অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশের সহযোগী হিসেবে রয়েছে। বিশেষ করে কৃষি খাতে নারীর উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে এসিআইএআর।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

কমনওয়েলথের পুরস্কার পেলেন বাংলাদেশের শারমিন

'কমনওয়েলথ পয়েন্টস অব লাইট' পুরস্কার পেয়েছেন বাংলাদেশের শারমিন সুলতানা। ব্যতিক্রমী স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের সেবা দেওয়ায় যুক্তরাজ্যের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ তাঁকে এ পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেন। সম্প্রতি বাংলাদেশে যুক্তরাজ্যের হাইকমিশন এ তথ্য জানিয়েছে।

শারমিন সুলতানা কক্সবাজারের কুতুপালং রোহিঙ্গা আশ্রয়কেন্দ্রে নারীদের স্বাস্থ্য সহায়তার প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। তিনি গর্ভকালীন, প্রসব ও প্রসব-পরবর্তী প্রয়োজনীয় সেবা দিয়ে থাকেন। একই সাথে নারীরা যাতে নিরাপদে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ ঠেকাতে পারে তা নিশ্চিত করেন তিনি। ধর্ষণের শিকার নারীদের ক্ষেত্রে জরুরিভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করাও তার কাজের অংশ।

এ বছর লন্ডনে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সরকার প্রধানদের সম্মেলনে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ ৫৩টি দেশের স্বেচ্ছাসেবীদের অনুপ্রেরণামূলক এসব কর্মকাণ্ডের জন্য ধন্যবাদ দেন।

শ্রমজীবী নারীর জন্য হোস্টেল নির্মাণ

নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় শ্রমজীবী নারীদের জন্য ৯ তলাবিশিষ্ট হোস্টেলের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। ৭ই জুলাই শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক এ কাজের উদ্‌বোধন করেন।

শ্রম মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ০.৫৫ একর জমির ওপর প্রায় ৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে এই ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। ভবনে ৭০০ জন শ্রমজীবী নারী থাকতে পারবেন। অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী জানান, আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন এই ভবনে শ্রমজীবী নারীরা স্বল্প খরচে থাকতে পারবেন।

মা সমাবেশ

গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলা শিক্ষা অফিসের উদ্যোগে কাপাসিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজন করা হয় মা সমাবেশের। ২৪শে জুলাই অনুষ্ঠিত হয় এ মা সমাবেশ।

এ মা সমাবেশে উপজেলার ১৭৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ১ হাজার ৬০০ মা অংশ নেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন ১৭৯ জন প্রধান শিক্ষক। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সাংসদ সিমিন হোসেন রিমি। এবারের মা সমাবেশের মূল উদ্দেশ্য ছিল, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে যোগাযোগ ও সামাজিক বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ।

ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক পেলেন রুনা লায়লা

'শিল্পী ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক ২০১৮' এবার দেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংগীত শিল্পী রুনা লায়লাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে ৩০শে জুলাই তৃতীয়বারের মতো আয়োজন করা হয় এ পদক প্রদান অনুষ্ঠানের।

কিংবদন্তি সংগীত শিল্পী ফিরোজা বেগমকে স্মরণীয় করে রাখতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৬ সাল থেকে প্রবর্তন করা হয় 'ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক' পুরস্কার। তখন থেকে প্রতিবছর দেশের একজন বরেণ্য সংগীত শিল্পী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের প্রথম স্থান অধিকারীকে এই পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৌরশক্তি ও কৃষিতে বিনিয়োগ বাড়ানোর তাগিদ

জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ ও বনমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। ১৫ই জুলাই রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে 'এ ক্লাইমেট রেসিলেন্ট সাউথ এশিয়া: টার্নিং ক্লাইমেট স্মার্ট ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি ইনটু রিয়েলিটি' শীর্ষক সেমিনারে তিনি এ আহ্বান জানান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশ ও বনমন্ত্রী বলেন, ভৌগোলিক কারণেই পরিবেশ দূষণে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। বিশ্বের কোথাও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবিলা যেমন সম্ভব হচ্ছে না তেমনি বাংলাদেশেও। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আমাদের আরো গবেষণা করা প্রয়োজন।

পরিবেশ ও বনমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ১৫ই জুলাই ২০১৮ হোটেল সোনারগাঁওয়ে 'A Climate Resilient South Asia: Turning Climate Smart Investment Opportunities into Reality' *শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি*

মন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকি হ্রাসে সরকারের নেওয়া পদক্ষেপগুলো বিশ্বে প্রশংসিত হচ্ছে। বর্তমানে ৯৩ শতাংশ পানি ধরে রাখছে ভারত, চীন ও নেপাল। মাত্র ৭ শতাংশ পানি পাচ্ছে বাংলাদেশ। এই দেশগুলোতে যখন অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হয় তখন তারা তাদের পানি আমাদের দেশে নিষ্কাশন করে। ফলে প্রতিবছর এদেশে বন্যা হচ্ছে। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের মতো ছোটো ছোটো দেশগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে এফবিসিসিআই সভাপতি শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন ২১ শতকের অন্যতম বড়ো এক চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। দেশের ব্যবসায়ীরা নবায়ণযোগ্য জ্বালানি ব্যবস্থা প্রবর্তন, পরিবেশবান্ধব ও সবুজ কারখানা গড়ে তুলেছে। সেইসাথে পরিবেশ সুরক্ষা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দিকটিতে খেয়াল রেখে দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো স্থাপন করার ক্ষেত্রে তাদের সহায়তা অব্যাহত রেখেছে। বিশ্বের ১০টি সবুজ কারখানার ৭টিই বাংলাদেশে অবস্থিত বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষমেলা উদ্‌বোধন

পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পলিথিনের ব্যবহার কমিয়ে বিকল্প হিসেবে পাটের তৈরি সোনালি ব্যাগ ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৮ই জুলাই বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০১৮'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে এ আহ্বান জানান তিনি।

তিনি জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৮ এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদের স্মরণে সারাদেশে একযোগে ৩০ লাখ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন। প্লাস্টিককে বিশ্বব্যাপী সমস্যা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, পাটের পলিমার থেকে যেটা পচনশীল সেই ধরনের ব্যাগ তৈরি হচ্ছে। আমরা এটার নাম দিয়েছি সোনালি ব্যাগ, এই ব্যাগ পরিবেশ দূষণ করবে না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কাজেই আমি মনে করি এই সোনালি ব্যাগটা পলিথিনের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। তাছাড়া পাটের ছোটো ছোটো থলে, ব্যাগ এগুলো ব্যবহার করা যায়। এমনকি ফ্যাশনের জন্যও ব্যবহার করা যায়। আমি যে ব্যাগটা (হ্যান্ডব্যাগ) ব্যবহার করছি সেটা পাটের তৈরি ব্যাগ।

জাতীয় পরিবেশ পদক পেল ওয়ালটন

জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৮ পেল দেশে ইলেকট্রনিক্স জায়ান্ট ওয়ালটন গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। চলতি বছর, পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ ক্যাটাগরিতে এই পদক পেল ওয়ালটন।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলার উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে জাতীয় পরিবেশ পদক বিতরণ করেন। প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ভাইস চেয়ারম্যান এসএম শামসুল আলম।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

মুক্তিযোদ্ধারা ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পাবেন

এখন থেকে দেশের মুক্তিযোদ্ধারা ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। উপজেলা, জেলা, বিভাগীয় ও বিশেষায়িত সরকারি হাসপাতালে মুক্তিযোদ্ধারা এ সেবা নিতে পারবেন। ২২শে জুলাই মুক্তিযোদ্ধাদের এই চিকিৎসা সেবা প্রদানে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

এক প্রতিক্রিয়ায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেন, 'মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য আমরা প্রাথমিকভাবে ১৪টি বিশেষায়িত হাসপাতালকে ১৫ লাখ টাকা করে অগ্রিম দিয়ে রাখব। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা অনুযায়ী উপজেলা, জেলা, বিভাগীয় হাসপাতালগুলোকে ১০ থেকে ১৫ লাখ টাকা করে দেব। আগামীকালের (২৩শে জুলাই) মধ্যেই এই টাকা ছাড় দিয়ে দেব, তাদের কাছে চলে যাবে। একজন মুক্তিযোদ্ধা ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা সহযোগিতা পাবেন'।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আরো বলেন, আমরা চাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে যারা জীবন বাজি রেখে দেশকে স্বাধীন করেছেন, তাদের প্রকৃত সম্মান, রাষ্ট্রের কাছ থেকে যেসব ন্যায্য পাওয়া রয়েছে তা যেন নিশ্চিত করতে পারি। এরই একটি অংশ চিকিৎসা।

মন্ত্রী বলেন, ওষুধপত্র, বিভিন্ন টেস্ট, হাসপাতালের সিট ভাড়া, যা

স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হকের উপস্থিতিতে ২২শে জুলাই ২০১৮ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়–পিআইডি

যা আছে বিনামূল্যে দেওয়া হবে। একজন মুক্তিযোদ্ধাকে তাঁর পকেট থেকে কোনো অর্থই ব্যয় করতে হবে না। এই মুহূর্তে নীতিমালায় ৫০ হাজার টাকা রয়েছে। আমরা সেটা ২ লাখ টাকায় উন্নীত করব খুব দ্রুতই।

মুক্তিযোদ্ধারা বিশেষায়িত যে হাসপাতালগুলোতে সেবা পাবেন সেগুলো হলো–ঢাকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল, জাতীয় ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর), জাতীয় কিডনি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসাইন্সেস হাসপাতাল, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, খুলনার শহিদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, গোপালগঞ্জের শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

সড়ক পরিবহণ আইন ২০১৮

সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রেখে 'সড়ক পরিবহণ আইন ২০১৮'-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে সরকার। ৬ই জুলাই সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে সম্পূরক এজেন্ডা হিসেবে বহুল আলোচিত সড়ক পরিবহণ আইনের এ খসড়ায় মন্ত্রিসভা চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়। এই আইনে বলা হয়, সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হত্যাকাণ্ড হিসেবে প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ সাজা হবে মৃত্যুদণ্ড।

নিরাপদ সড়ক নির্মাণে তিন প্রকল্প

দুর্ঘটনা হ্রাস ও নিরাপদ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণের উদ্দেশ্যে তিনটি প্রকল্পসহ মোট ১১টি প্রকল্পের অনুমোদন দেয় জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)। ৭ই আগস্ট শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেকের সভায় অনুমোদিত এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট ব্যয় হবে ৬ হাজার ৪৪৮ কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনা এতে সভাপতিত্ব করেন।

সড়ক নির্মাণ সংক্রান্ত যে ৩টি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে সেগুলো হলো–

১. নোয়াখালী জেলার সোনাপুর থেকে চেয়ারম্যান ঘাট সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।

২. দিনাজপুর ও নীলফামারী জেলা সংলগ্ন বীরগঞ্জ-খানসামা- দাড়োয়ানী, খানসামা-রানীবন্দর এবং চিরিবন্দর- আমতলী বাজার জেলা মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প।

৩. মৌলভীবাজারের 'কুলাউড়া-পৃথিমপাশা-হাজীপুর-শরীফপুর (জেড-২৮২২) সড়কের ১৪তম কিলোমিটারে পিসি সেতু (রাজাপুর সেতু) নির্মাণ ও ৭ দশমিক ৫ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

টঙ্গী-জয়দেবপুর ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণ

রেল ভবনে বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-টঙ্গী ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েলগেজ রেললাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর ২য় ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণের চুক্তি ২৪শে জুলাই স্বাক্ষরিত হয়। ভারতের লাইন অব ক্রেডিট-এর অর্থায়নে এ লাইন দুটি নির্মিত হবে। ভারতীয় প্রতিষ্ঠান অ্যাফকন্স এবং কল্পতরু পাওয়ার ট্রান্সমিশন লিমিটেড (কেপিটিএল) যৌথভাবে-এর নির্মাণ কাজ করবে।

এ চুক্তিতে বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আই) কাজী রফিকুল আলম এবং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অ্যাফকন্স ভাইস প্রেসিডেন্ট অনুপ কুমার গুরু। চুক্তি অনুযায়ী ৩৬ মাসের মধ্যে কাজ শেষ করবে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশি টাকায় ১ হাজার ৩৯৩ কোটি ৭৮ লাখ ৯০ হাজার টাকা চুক্তি মূল্য।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে রেলপথ মন্ত্রী মুজিবুল হক বলেন, এ প্রকল্পটি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখন ঢাকা থেকে টঙ্গী পর্যন্ত ঢোকা ও বের হবার জন্য দুটি রুট ব্যবহার করতে হয়। আরো দুটি লাইন হলে কম সময়ের ব্যবধানে ট্রেন চলতে পারবে। এতে অধিক হারে যাত্রী পরিবহণ করা যাবে। এ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোফাজ্জল হোসেন, মহাপরিচালক আমজাদ হোসেন, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ, অর্থায়নকারী

ভারতীয় এক্সিম ব্যাংক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

যানজট কমাতে নতুন পরিকল্পনা

আজিমপুর থেকে গাবতলী যেতে সময় লাগবে মাত্র ১১ মিনিট। বর্তমান সরকার যানজট নিরসনের ও সময় লাঘবের জন্য ৭৭৫ কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে যার মাধ্যমে রাজধানীর আজিমপুর থেকে গাবতলী পর্যন্ত বেশ কিছু উড়াল সড়ক এবং আন্ডারপাস নির্মাণ করা হবে। এর ফলে রাজধানীর যানজট অনেক কমবে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় এই প্রকল্পের প্রস্তাবটি খতিয়ে দেখছে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

রেলপথমন্ত্রী মো. মুজিবুল হকের উপস্থিতিতে ২৪শে জুলাই ২০১৮ রেল ভবনে ঢাকা-টঙ্গী ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েলগেজ এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর ২য় ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়–পিআইডি

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশে কোনো মাদক ব্যবসায়ী থাকবে না

র‍্যাবের মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদ বলেছেন, বাংলাদেশে কোনো মাদক ব্যবসায়ী থাকবে না। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আপনাদের সাথে নিয়ে মাদক ব্যবসায়ীদের চিহ্নিত করে শহর-গ্রাম সব জায়গা থেকে বিতারিত করব। পরবর্তী প্রজন্মকে মাদকের ভয়ংকর থাবা থেকে রক্ষা করতে হবে। ৩০শে জুলাই গোপালগঞ্জ শেখ মণি স্মৃতি অডিটোরিয়ামে গোপালগঞ্জ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন আয়োজিত রোজি জামাল মহিলা কাবাডির পুরস্কার বিতরণ, পূবালী ব্যাংক দাবা প্রশিক্ষণ ও বাড়তি ওষুধে নতুন জীবন কর্মসূচির উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে মাদকাসক্তি পরীক্ষা

সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরির ক্ষেত্রে ডোপ টেস্ট (মাদক পরীক্ষা) করতে হবে। যারা ফিটনেস পরীক্ষায় ফলাফলে নেতিবাচক হবেন, তারা চাকরির জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। পর্যায়ক্রমে ব্যাংক, বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য চাকরির ক্ষেত্রেও এটি প্রয়োগ করা হবে। মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন রোধে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অ্যাকশন প্লান থেকে সম্প্রতি এ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। সূত্র জানায়, সরকারি চাকরিতে যোগ দেওয়ার আগে সব প্রার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় ডোপ টেস্ট করা হবে। কেউ যদি ইয়াবা, গাঁজা ও হেরোইনের মতো মাদক সেবন করে থাকেন– তিনি চাকরি পাবেন না। কারণ ডোপ টেস্টে সেটা ধরা পড়বে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ– মাদক নিয়ন্ত্রণে স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনা (এক বছর), মধ্য মেয়াদি (দুই বছর) ও দীর্ঘ মেয়াদি (পাঁচ বছর) পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

চলো যাই যুদ্ধে, মাদকের বিরুদ্ধে

সম্প্রতি র‍্যাব মাদক বিরোধী বিজ্ঞাপন নির্মাণ করে 'চলো যাই যুদ্ধে, মাদকের বিরুদ্ধে'– যার প্রচারণা অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। ২৩শে জুলাই রাজধানীর কারওয়ান বাজার র‍্যাব মিডিয়া সেন্টারে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করে লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইং বিভাগ। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন, জঙ্গিবাদ নির্মূলের ন্যায় মাদককেও নির্মূল করব। সেলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মাদক বিরোধী যুদ্ধ শুরু হয়েছে। মাদক মুক্ত করার প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে মাদকসেবীদের নিরাময় ও পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে সকলে এ বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে একমত পোষণ করে আগামীতে এরকম মাদক বিরোধী প্রচারণা আরো বেশি করে সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান।

প্রতিবেদন: আছাব আহমেদ

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

মানসিক স্বাস্থ্য আইনের খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন

মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা বা সম্পত্তির তালিকা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনায় অবহেলা করলে বিভিন্ন মেয়াদে জেল-জরিমানার বিধান রেখে 'মানসিক স্বাস্থ্য আইন ২০১৮'-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। ১৬ই জুলাই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ খসড়ার অনুমোদন দেওয়া হয়।

খসড়ায় মানসিক সেবায় নিয়োজিত পেশাজীবী হিসেবে কোনো ব্যক্তি মানসিক অসুস্থতা সম্পর্কে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মিথ্যা সনদ দিলে তার জন্যও অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সূত্রে জানা যায়, বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা সংক্রান্ত নাগরিকদের মর্যাদা সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া, সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করা, পুনর্বাসন ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে একটি যুগোপযোগী আইন প্রণয়নের অংশ হিসেবে এই আইনটি করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত আইনে ৩১টি ধারা রয়েছে। এতদিন ১৯১২ সালে প্রণয়ন করা ইংরেজি আইনটি দিয়ে চলছিল।

চিকিৎসাসেবা বিষয়ক মূল্যতালিকা টানাতে নির্দেশ

আইন অনুসারে দেশের বেসরকারি ক্লিনিক বা হাসপাতাল, ল্যাবরেটরি, ডায়াগনস্টিক সেন্টারের পরীক্ষাসহ চিকিৎসাসেবা বিষয়ক মূল্যতালিকা ও ফি প্রকাশ্য জায়গায় (পাবলিক প্লেস) ১৫ দিনের মধ্যে টানানোর নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। ২৪শে জুলাই এ নির্দেশনা দেওয়া হয়। একই সঙ্গে মেডিক্যাল অর্ডিন্যান্স ১৯৮২ অনুসারে নীতিমালা তৈরি এবং বাস্তবায়নের জন্য ৬০ দিনের মধ্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করতেও বলা হয়েছে।

আদেশে হাসপাতালের জরুরি বিভাগ আধুনিকায়ন হচ্ছে

দেশের সব সরকারি হাসপাতালগুলোর জরুরি বিভাগ আধুনিকায়ন (পূর্ণাঙ্গ জরুরি বিভাগ) করতে উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। প্রাথমিক অবস্থায় জেলা হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলোর জরুরি বিভাগ আধুনিক চিকিৎসার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। পরবর্তীতে উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও জরুরি বিভাগকে আধুনিকায়ন করা হবে। ২৫শে জুলাই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নতুন চারটি ইমার্জেন্সি অপারেশন থিয়েটার, সার্জিক্যাল এইচডিইউ এবং ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগের উন্নত যন্ত্রপাতি চালুকরণের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, হাসপাতালের সব ধরনের জরুরি অপারেশন বিনামূল্যে সম্পন্ন করাসহ অন্যসব অপারেশন নামমাত্র মূল্যে সম্পন্ন করারও

স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ২৫শে জুলাই ২০১৮ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগের উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি চালুকরণ ও নবনির্মিত আনসার ব্যারাকের উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা ১ শিফটের পরিবর্তে ২ শিফটে এবং জরুরি পরীক্ষাসমূহ সার্বক্ষণিক সম্পন্নে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

কমিউনিটি ক্লিনিক চলবে ট্রাস্টের অধীনে

গ্রামের জনসাধারণকে সমন্বিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দিতে চালুকৃত কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো চলবে ট্রাস্টের অধীনে। ৩০শে জুলাই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা আইন ২০১৮'-এর খসড়া অনুমোদিত হয়। খসড়ায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এই ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য ১৪ সদস্যের একটি বোর্ড থাকবে। এই বোর্ডের প্রধান হবেন প্রধানমন্ত্রী। এই ট্রাস্টে সরকারি বা বেসরকারি যে কেউ অনুদান দিতে পারবেন। তহবিলে সরকারি অনুদান থাকবে। যদি ট্রাস্ট আর্থিক সংকটে পড়ে, তাহলে সরকারের তহবিল থেকে অর্থ জোগান দেওয়া হবে।

প্রস্তাবিত আইনে ক্লিনিকগুলোর কর্মীদের চাকরি স্থায়ীকরণ, বেতন বৃদ্ধি, পদোন্নতির সুযোগ, অবসর ভাতা, গ্র্যাচুইটি সুবিধা রাখা হয়েছে।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষায় প্রয়োজন আলাদা বাজেট

সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়াতে সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান। তিনি বলেন, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সামাজিক কল্যাণ তহবিল থেকে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করা প্রয়োজন। এ কাজে তাদের সুরক্ষায় আলাদা বাজেট প্রস্তাব করা যেতে পারে। সম্প্রতি রাজধানীর বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন (বিএফডিসি) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের নিয়ে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি আয়োজিত 'প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেট বরাদ্দ' শীর্ষক ছায়া সংসদে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে তিনি আরো বলেন, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য মানবিক ও নাগরিক মূল্যবোধ জাগ্রত এবং ভারসাম্যমূলক নীতিমালা গ্রহণ করা দরকার। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রতিবন্ধীদের জন্য যে বরাদ্দ আছে তার পাশাপাশি প্রত্যেকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ মৌলিক চাহিদা পূরণে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি পালনে এগিয়ে আসতে হবে। প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয় করে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের মূল স্রোতে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব।

ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন, প্রতিবছর যেভাবে সর্বোচ্চ করদাতাকে সম্মানিত করা হয় ঠিক সেভাবে যেসব প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান করবে তাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা উচিত। প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে কর রেয়াত সুবিধাও প্রদান করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত প্রতিবন্ধীবান্ধব। তার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের নিয়ে কাজ করেন। একটি রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হলো প্রতিবন্ধীসহ সকল মানুষের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করা। যে জাতি প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর প্রতি যত সহানুভূতিশীল সে জাতি তত মানবিক।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ঢাবি

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)। রানার আপ হয়েছে ইডেন মহিলা কলেজ ও তৃতীয় হয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ১০ই আগস্ট চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনে (এফডিসি) প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্বে বিতর্কের বিষয় ছিল– 'প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার ও সুরক্ষায় সরকারের করণীয়'।

প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার মোজাম্মেল হক খান ও সাংসদ মমতাজ বেগম।

প্রতিবেদন: হাছিনা আক্তার

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

শীঘ্রই চালু হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানের শিশু আদালত

বাংলাদেশে প্রচলিত শিশু আইনের বিধান অনুযায়ী চালু হতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক শিশু আদালত। ঘরোয়া পরিবেশে এ আদালতে শিশু অপরাধীদের বিচার করা হবে। শিশু আইন অনুযায়ী বিচারক ও আইনজীবীর থাকবে না কালো কোট-গাউন, কর্মচারীদের থাকবে না আদালতের পোশাক, কর্মরত পুলিশের গায়ে থাকবে না পুলিশের পোশাক। আধুনিক এই শিশু আদালতে থাকবে ঘরোয়া পরিবেশ। শিশুদের স্বজনরাও থাকবে। শিশুদের জন্য বিশেষ অপেক্ষা কক্ষ থাকবে। যেখানে তারা আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে কথা বলতে পারবে। সমাজসেবা দপ্তরের প্রবেশন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে থাকবে ওই আদালতে হাজির হওয়া শিশুদের পরিচর্যা। সেখানে এমন পরিবেশ বিরাজ করবে যাতে শিশুরা বুঝতেই না পারে যে তারা সমাজের ঘৃণিত বা মারাত্মক অপরাধী।

এ প্রসঙ্গে দৈনিক কালের কণ্ঠে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে আইন সচিব আবু সালেহ শেখ মো. জহিরুল হকের উদ্ধৃতি থেকে জানা যায়, ২০১৩ সালে প্রণীত শিশু আইনে শিশুবান্ধব আদালত গঠন করার বিষয়টি থাকলেও এতদিন সে অনুযায়ী বিচার কার্য চালানো যায়নি। সম্প্রতি শিশু আদালতের আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে বাংলাদেশেও শিশু আদালত তৈরি হচ্ছে। আপাতত সারাদেশে ১৪টি শিশু আদালত গঠনের কাজ চলছে। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি জেলায় এমন আদালত করা হবে। তিনি জানান, ঢাকা ও চট্টগ্রামে দুটি আদালত গঠনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।

শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে মোবাইল অ্যাপ 'জয়' চালু

নির্যাতনের শিকার বা নির্যাতনের আশঙ্কা রয়েছে এমন নারী ও শিশুকে তাৎক্ষণিক সহায়তা দেওয়ার জন্য এটুআই প্রোগ্রামের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টি সেক্টরাল প্রোগ্রাম 'জয়' নামে একটি অ্যাপ তৈরি করেছে।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে ২৯শে জুলাই মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি অ্যাপটি উদ্‌বোধন করেন।

গুগল অ্যাপস্টোরের সার্চ অপশনে গিয়ে 'জয় ১০৯' লিখে সার্চ করে নিজেদের অ্যানড্রয়েড ফোনে অ্যাপটি নামিয়ে নিন ঝটপট। অ্যাপটির মাধ্যমে ব্যবহারকারী জরুরি মুহূর্তে তাৎক্ষণিক পুলিশ সুপার, মহানগর এলাকার উপ-পুলিশ কমিশনার, নির্দিষ্ট তিনটি এফএনএফ নম্বর এবং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে (১০৯) এসএমএস পাঠাতে পারবেন। এছাড়া, নির্যাতন বা সহিংসতার মুহূর্তে মোবাইলে নির্দিষ্ট জরুরি বাটন চেপে ভুক্তভোগীর জিপিএস লোকেশন, ছবি এবং অডিও রেকর্ডিং মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে জানানো যাবে। প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে জয় অ্যাপস সেন্টার থেকে সরাসরি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিনির্মাণে শিক্ষার বিকল্প নেই

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম পিছিয়ে থাকতে পারে না। তাই উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিনির্মাণে শিক্ষার বিকল্প নেই। ৩রা আগস্ট বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারী কলেজের ফলক উন্মোচনকালে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, এই কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাইশারীতে আলো জ্বালানো হলো, ফলে শিক্ষার্থীরা আলোকিত এবং আদর্শবান হয়ে দেশ ও মানুষের জন্য অবদান রাখবে। পরে প্রতিমন্ত্রী বাইশারী ইউনিয়ন পরিষদে ১৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সৌর বিদ্যুৎ ও টেউটিন বিতরণ এবং অনুদানের চেক প্রদান করেন।

পার্বত্য অসচ্ছল নারীদের মধ্যে গাভি বিতরণ

বান্দরবান সদর উপজেলার রাজবিলা, কুহালং, রেইছা ইউনিয়ন পরিষদ মাঠে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অর্থায়নে প্রত্যন্ত অঞ্চলের অসচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারের ৭০ জন নারীর মাঝে গাভি বিতরণ করা হয়েছে। ১লা আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং এ গাভি বিতরণ করেন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অর্থায়নে ১২ কোটি ৭৯ লাখ টাকা ব্যয়ে ১ হাজার তিনশ জন নারীকে গাভি বিতরণ ও গাভি লালনপালনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে বলে মন্ত্রী জানান।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

দুই বাংলার বাউল উৎসব

দুই বাংলার বাউল শিল্পীদের অংশগ্রহণে ১৫ই জুলাই থেকে শুরু হয় বাউল সংগীত উৎসব। লালন বিশ্ব সংঘ ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির যৌথ উদ্যোগে এবং ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় এ উৎসবের আয়োজন করা হয়। উৎসবের উদ্‌বোধন করেন একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। শিল্পকলা একাডেমির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সমবেত কণ্ঠে গান গেয়ে উৎসব শুরু করেন ৬০ জনের বেশি বাউল শিল্পী। তিন দিনব্যাপী বাউল উৎসবের এবারের স্লোগান 'মানুষতত্ত্ব যার সত্য হয় মনে সে কি অন্য তত্ত্ব মানে।' প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত চলে এ আয়োজন।

কাজী গিয়াস উদ্দীনের 'অর্ডার অব দি রাইজিং সান' অর্জন

জাপানের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা পেয়েছেন বাংলাদেশের শিল্পী কাজী গিয়াস উদ্দীন। জাপান সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা হচ্ছে 'অর্ডার অব দি রাইজিং সান'। ১০টি ধাপের এই সম্মাননা প্রতিবছর দেওয়া হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের। মূলত জাপানি নাগরিকদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে সম্মানিত করা উদ্দেশ্য হলেও বিদেশের কিছু গুণিজনকেও প্রতিবছর পদকপ্রাপ্তদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়। জাপান সরকার এ বছর বিদেশিদের তালিকায় যাদের নাম রেখেছেন তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশের শিল্পী গিয়াস উদ্দীন একজন। কয়েকদিন আগে ঢাকার জাপানি দূতাবাসে আয়োজিত বিশেষ এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে জাপানের রাষ্ট্রদূত হিরোইয়াসু ইজুমি সম্মাননা পদক ও সনদ তুলে দিয়েছেন শিল্পীর হাতে।

দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক উৎসব শুরু

'সৃজনে উন্নয়নে বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্যে অনুষ্ঠিত হয় দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক উৎসব। দেশের প্রতিটি জেলা শিল্পকলা একাডেমি, জেলা প্রশাসন ও জেলা তথ্য অফিসের সহযোগিতায় এ উৎসবের আয়োজন হয়। ঢাকা জেলার আয়োজন হয় সাভার ও কেরানীগঞ্জে। ২০শে জুলাই সাভারে ঢাকা জেলার উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর ২০শে জুলাই ২০১৮ সাভার কলেজ প্রাঙ্গণে আয়োজিত সাংস্কৃতিক উৎসব উপভোগ করেন–পিআইডি

নাচ গান ও কবিতায় নজরুল উৎসব

নজরুল নিজেই বলেছিলেন, তাঁর এক হাতে বাঁশের বাঁশরী আরেক হাতে রণতূর্য। তিনি অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, তিনি গানের বুলবুল। সমাজে মানবতা ও সাম্যের জয়গানের আকাঙ্ক্ষায় কবির ১১৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় নজরুল উৎসব। ৬ই জুলাই সন্ধ্যায় জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে দুই দিনব্যাপী এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ উৎসবের আয়োজন করে বাংলাদেশ নজরুল সংগীত সংস্থা।

উদীচীর সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব পালিত

দেশের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন উদীচীর ৫০ বছরের পথচলাকে স্মরণীয় করে রাখতে বছরব্যাপী নানা আয়োজন করে এ সংগঠনটি। এর অংশ হিসেবে ৪ঠা জুলাই থেকে প্রথমবারের মতো নৃত্য উৎসবের আয়োজন করে। 'নৃত্যে-ছন্দে ভাঙি পাথর সময়' প্রতিপাদ্যে দুই দিনের এ উৎসবের উদবোধন করেন রাজশাহীর বরেণ্য নৃত্যগুরু বজলুর রহমান। জাতীয় সংগীত ও উদীচীর দলীয় সংগীতের সমবেত পরিবেশনা দিয়ে শুরু হয় মূল আয়োজন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উদীচী ঢাকা মহানগর সংসদের সহসভাপতি এ এন রাশেদ।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন তথা আজকের 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন বিল' উত্থাপন করেন। এরফলে চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতার ফসল হিসেবে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার আন্ধারমানিক ও আশুলিয়ার কবিরপুর এলাকায় ১০ হাজার ৩৯৫ শতাংশ (৩১৫ বিঘা) জমির ওপর স্থাপিত হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি'।

বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটিতে প্রবেশের জন্য দুটি গেট রয়েছে। একটি গেট গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার আন্ধারমানিক এলাকা দিয়ে, অন্যটি আশুলিয়ার কবিরপুর দিয়ে। আন্ধারমানিক এলাকা দিয়ে এ ফিল্ম সিটিতে ঢুকতেই হাতের বাঁ পাশে রয়েছে একটি বিশাল লেক এবং ডান পাশে ১টি পুকুর। পুকুর ঘাটটি বাঁধাই করা। এর দুই পাশে রয়েছে খেজুর গাছ। একটু সামনে গেলে হাতের ডান পাশে একটি টিনশেড ভবন। তার সামনে ফুলের বাগান। এখান থেকেই বাম দিক দিয়ে সোজা রাস্তাটি চলে গেছে কবিরপুর এলাকার মূল গেট পর্যন্ত। ওই রাস্তাটির বাঁ পাশে লেকসহ খেজুরবাগান ও ১টি জঙ্গল। আর একটু সামনেই লেকের ওপর রং করা একটি লোহার ব্রিজ। এর ডান পাশে রয়েছে বন, টিনশেডের ১টি বাড়ি ও ১টি বিশাল ভবন। এ ফিল্ম সিটির পশ্চিম পাশে রয়েছে লাল মাটির টেক ও গজারি বন। এছাড়াও নানা উপকরণে সাজানো হয়েছে ফিল্ম সিটিটি।

২০১৭ সালে প্রকল্পটির জন্য প্রথম বাজেট হিসেবে ১৯ কোটি ৮০ লাখ টাকা দেয় সরকার। এই টাকাতেই তৈরি হয়েছে ১টি পাওয়ার সাবস্টেশন, পানির পাম্প, ডরমেটরি, কৃত্রিম বাজার, গ্রাম্য বাড়ি, সুপ্রশস্ত লেক, বাংলো, শুটিং ইউনিট, থাকার জন্য একাধিক রুম, প্রবেশের জন্য বড়ো দুটি গেট ও মূল ফটক। কেনা হয়েছে জেনারেটর, স্পিডবোট। প্রকল্পে রয়েছে প্রশস্ত রাস্তা, অসংখ্য খেজুর গাছ আর শালবন, শুটিং ফ্লোর, মেলা বা সেট ফেলার জন্য বড়ো মাঠ। পুরো ছবি কিংবা নাটকের শুটিং এখানেই শেষ করা যাবে।

এছাড়া ফিল্ম সিটির ডরমেটরিটি চার তলায়। এর চারপাশ থেকেই ক্যামেরা ধরা যাবে। ভেতরে বাসাবাড়ির মতো আছে আলাদা আলাদা ইউনিট। নাটক-সিনেমার অভিনেতাদের চিত্রানুযায়ী বাসা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। শুটিংয়ে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বসানো হয়েছে পাওয়ার স্টেশন। খাবার পানির জন্য বসানো হয়েছে পাম্প। ডরমেটরির অদূরেই তৈরি করা হয়েছে একটি কৃত্রিম বাজার। টিনের ছাউনি আর চারপাশ খোলা বাজারটিতে কাঁচাবাজার, এমনকি মাছের বাজারের সেটও তৈরি করা হয়েছে। এর পাশেই টিনের ছাউনি দিয়ে দুটি গ্রামীণ আবহের বাড়ি। এখানে ফোক ছবির শুটিং করা যাবে। শহরের বাড়ির দৃশ্য ধারণের জন্য রয়েছে একটি ডুপ্লেক্স বাড়ি। কলেজ কিংবা স্কুল দেখানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে একটি ভবন।

৩০০ কোটি টাকার এই প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হবে ২০২১ সালে। এই ফিল্ম সিটিকে শুধু শুটিং নয়, পিকনিক স্পট হিসেবেও ব্যবহার করা যাবে। নাটক, সিনেমা, প্রামাণ্যচিত্র যারা বানাতে চান এখনই

সেখানে গিয়ে বানাতে পারবেন। রাত যাপন করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে এফডিসির অনুমতি নিতে হবে। এ ফিল্ম সিটি নির্মাণের মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতের সবার দীর্ঘদিনের স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো।

প্রতিবেদন: মিতা খান

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের সিরিজ জয়

বিদেশের মাটিতে টাইগাররা সর্বশেষ ওয়ানডে সিরিজটি জিতেছিল আজ থেকে নয় বছর আগে ২০০৯ সালে। জিম্বাবুয়ে সফরে গিয়ে ৫ ম্যাচ সিরিজের ওয়ানডেতে স্বাগতিকদের ৪-১-এ হারিয়েছিল লাল-সবুজের অদম্য দলটি। নয় বছর পরে এসে আবার বিদেশের মাটিতে ওয়ানডে সিরিজ জিতল বাংলাদেশ। সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ১৮ রানে হারিয়ে ২-১-এ সিরিজ জিতে নিয়েছে কোচ স্টিভ রোডসের শিষ্যরা। গত ২৮শে জুলাই সেইন্ট কিটসে টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে তামিম ইকবালের ১০৩, মাহমুদ উল্লাহ রিয়াদের ৬৭ ও মাশরাফির ৩৬ রানের ঝড়ো ইনিংসে ৬ উইকেটের বিনিময়ে ৩০১ রানের বড়ো সংগ্রহ পায় বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের দেওয়া ৩০২ রানের চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে নির্ধারিত ৫০ ওভার শেষে ৬ উইকেটের বিনিময়ে এসেছে ২৮৩ রান। এর আগে ২২শে জুলাই সিরিজের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের দেওয়া ২৮০ রানের টার্গেটে খেলতে ৫০ ওভারে ৯ উইকেটের বিনিময়ে ২৩১ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ফলে ৪৯ রানের সহজ জয় পায় বাংলাদেশ।

বলা বাহুল্য, এই সিরিজেই এক ম্যাচ বিরতিতে দুটি সেঞ্চুরি করলেন তামিম। প্রথমটি এসেছিলে ২২শে জুলাই গায়নায়। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে অপরাজিত ছিলেন ১৩০ রানে।

টি-টোয়েন্টির শিরোপাও বাংলাদেশের

তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের শিরোপা উঠেছে টাইগারদের হাতে। তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে বৃষ্টি আইনে ১৯ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতল বাংলাদেশ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার লডারহিলে গত ৬ই আগস্ট বাংলাদেশ সময় সকাল ৬টায় শুরু হওয়া ম্যাচে লিটন দাস ও তামিম ইকবালের ব্যাটে ভর করে দারুণ শুরু পায় টাইগাররা। নির্ধারিত ২০ ওভার শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামনে ১৮৫ রানের টার্গেট দেয় তারা। আর এই লক্ষ্যে খেলতে নেমে বাংলাদেশের মতোই বৃষ্টি বাধায় পড়তে হয় ক্যারিবিয়ানদেরও। আর বৃষ্টি আইনেই শেষ পর্যন্ত ১৯ রানের জয় পায় বাংলাদেশ। ১৭.১ ওভারে ১৩৫ রান তোলার পর বৃষ্টিতে আর খেলতে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

দেশের দ্রুততম মানব হাসান মিয়া

টানা সাতবারের দ্রুততম মানব মেজবাহ আহমেদকে হারিয়ে দেশের দ্রুততম মানবের মুকুট এখন বিকেএসপির হাসান মিয়ার মাথায়। ১৪তম সামার অ্যাথলেটিকসে ১০.৮০ সেকেন্ড সময় নিয়ে ১০০ মিটারে সোনা জিতেছে বিকেএসপির এই ছাত্র। শ্রেষ্ঠত্ব হারানো মেজবাহ সময় নিয়েছেন ১০.৯০ সেকেন্ড। টানা সাতবার দ্রুততম মানবী হওয়ার রেকর্ড ছুঁয়েছেন নৌবাহিনীর শিরীন আক্তার (১২.২০ সেকেন্ড)। বিকেএসপিতে নবম শ্রেণিতে পড়া হাসানের বয়স ১৬। জাতীয় পর্যায়ে এবারই প্রথমবারের মতো অংশ নিয়েই চমক উপহার দিল।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজঙ্গী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সৃজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এ সকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।

বিশ্বজুড়ে আগস্ট: স্মরণীয় ও বরণীয়

১লা আগস্ট ১৯৭১	নিউইয়র্ক শহরের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে 'দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' অনুষ্ঠিত
২রা আগস্ট ১৯২২	টেলিফোনের আবিষ্কারক স্কটিশ বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের পরলোকগমন
২রা আগস্ট ১৯৩৪	জার্মানির নেতা হিসেবে এডলফ হিটলারের আবির্ভাব
২রা আগস্ট ১৯৯০	ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখল এবং প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ শুরু
৩রা আগস্ট ১৯৫৬	বাংলাদেশে নির্মিত প্রথম সবাক চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ'-এর মুক্তি
৩রা আগস্ট ১৯৬০	ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসন থেকে আফ্রিকার দেশ নাইজারের স্বাধীনতা লাভ
৪ঠা আগস্ট ১৯২৯	বিখ্যাত ভারতীয় বাঙালি গায়ক ও নায়ক কিশোর কুমারের জন্ম
৪ঠা আগস্ট ১৯৬১	৪৪তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার জন্ম
৪ঠা আগস্ট ২০০৭	মঙ্গলের উদ্দেশ্যে NASA'র রোবোটিক মহাকাশযান 'ফিনিক্স' উৎক্ষেপণ
৫ই আগস্ট ১৯৩০	চাঁদে অবতরণকারী প্রথম মানব মার্কিন নভোচারী নীল আর্মস্ট্রংয়ের জন্ম
৫ই আগস্ট ১৯৬২	বিখ্যাত মার্কিন চলচ্চিত্র অভিনেত্রী মেরিলিন মনরোর পরলোকগমন
৬ই আগস্ট ১৮২৫	স্প্যানিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে বলিভিয়ার স্বাধীনতা লাভ
৬ই আগস্ট ১৯৪৫	জাপানের হিরোশিমায় 'লিটল বয়' নামের বিশ্বের প্রথম পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে যুক্তরাষ্ট্র
৭ই আগস্ট ১৯১৩	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের উদ্‌বোধন
৭ই আগস্ট ১৯৪১	বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরলোকগমন
৮ই আগস্ট ১৯৩০	বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছার জন্ম
৮ই আগস্ট ১৯৬৭	ব্যাংকক ঘোষণার মধ্য দিয়ে গঠিত হয় ASEAN
৯ই আগস্ট ১৯০২	ব্রিটিশ সিংহাসনে রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক
৯ই আগস্ট ১৯৪৫	জাপানের নাগাসাকিতে 'ফ্যাটম্যান' নামের বিশ্বের দ্বিতীয় পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে যুক্তরাষ্ট্র
৯ই আগস্ট ১৯৭৩	লালগ্রহ মঙ্গলের উদ্দেশ্যে Mars ৭ নামক মহাকাশযান প্রেরণ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন
১০ই আগস্ট ১৯৯৩	প্যারিসের বিশ্বখ্যাত 'ল্যুভর' জাদুঘরের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়
১০ই আগস্ট ৩০ খ্রিষ্টপূর্ব	মিশরের রানি ক্লিওপেট্রার মৃত্যু (মতান্তরে ১২ আগস্ট)
১০ই আগস্ট ১৯২৪	বাংলাদেশের বরেণ্য চিত্রশিল্পী এস. এম. সুলতানের জন্ম
১১ই আগস্ট ১৯৩৮	ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকারী সর্বকনিষ্ঠ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি কার্যকর করে ব্রিটিশ সরকার
১২ই আগস্ট ১৯৮১	পার্সোনাল কম্পিউটার IBM অবমুক্ত
১২ই আগস্ট ২০০৪	ভাষাবিদ ও প্রথাবিরোধী লেখক হুমায়ুন আজাদের পরলোকগমন
১৩ই আগস্ট ১৯১০	Lady with the lamp খ্যাত ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের মৃত্যু
১৩ই আগস্ট ১৯৬১	ঐতিহাসিক বার্লিন প্রাচীর নির্মাণ শুরু
১৪ই আগস্ট ১৯৪৭	ভারত বিভক্তির মাধ্যমে পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভ
১৫ই আগস্ট ১৭৬৯	ফরাসি বিপ্লবের নেতা নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জন্ম
১৫ই আগস্ট ১৯১৪	আনুষ্ঠানিকভাবে পানামা খাল চালু
১৫ই আগস্ট ১৯৪৭	ভারতের স্বাধীনতা লাভ
১৫ই আগস্ট ১৯৭৫	বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার নিহত
১৭ই আগস্ট ২০০৬	বিশিষ্ট কবি শামসুর রাহমানের পরলোকগমন
১৮ই আগস্ট ১৯৪৯	বিশিষ্ট নাট্যকার সেলিম আল দীনের জন্ম
১৮ই আগস্ট ১৯৫৮	প্রথম বাঙালি সাঁতারু হিসেবে ব্রজেন দাসের ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম
১৮ই আগস্ট ১৯৬১	ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) যাত্রা শুরু
১৯শে আগস্ট ১৯৩৫	বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক জহির রায়হানের জন্ম
২০শে আগস্ট ১৯৪৪	ভারতের সপ্তম প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জন্ম
২০শে আগস্ট ১৯৭১	বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানের শাহাদতবরণ
২০শে আগস্ট ১৯৮৮	দীর্ঘ ৮ বছরব্যাপী সংঘটিত ইরাক-ইরান যুদ্ধের সমাপ্তি
২১শে আগস্ট ২০০৪	বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ-এর আওয়ামী লীগের সমাবেশে ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা
২৩শে আগস্ট ১৯১৪	প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে জাপান
২৩শে আগস্ট ১৯৬১	সর্বসাধারণের জন্য World wide web (www) উন্মুক্ত করা হয়
২৫শে আগস্ট ১৮১৯	বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কারক জেমস্ ওয়াটের মৃত্যু
২৫শে আগস্ট ২০১২	চাঁদে অবতরণকারী প্রথম নভোচারী নীল আর্মস্ট্রংয়ের মৃত্যু
২৬শে আগস্ট ১৯৯০	অবহেলিত মানুষের 'মা' খ্যাত মাদার তেরেসার জন্ম
২৯শে আগস্ট ১৯৭৬	বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের পরলোকগমন
৩০শে আগস্ট ১৮৬০	ব্রিটেনে বিশ্বের প্রথম ট্রাম সার্ভিস চালু
৩১শে আগস্ট ১৯৭৫	স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় চীন।

জহির রায়হান বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও চলচ্চিত্র পরিচালক

জহির রায়হানের জন্ম ১৯শে আগস্ট, ১৯৩৫ ফেনী জেলার মজুপুর গ্রামে। তাঁর পিতা. মাওলানা মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ (কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক এবং ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ)। তিনি সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক শহিদ শহীদুল্লা কায়সারের ছোটো ভাই।

ফেনীর আমিরাবাদ হাইস্কুল থেকে এসএসসি (১৯৫০) এবং ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে এইচএসসি (১৯৫৩) পাস করেন। তিনি ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় অনার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে কলকাতার প্রমথেশ বড়ুয়া মেমোরিয়াল ফটোগ্রাফি স্কুলে ফটোগ্রাফির ওপর পড়াশুনা করেন।

১৯৫১-১৯৫৭ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করায় গ্রেফতার হন। জহির রায়হান একজন কলম সৈনিক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। তিনি হানাদারবাহিনীর গণহত্যা বিষয়ক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র *Stop Genocide* নির্মাণ করেন।

তিনি ১৯৫৬'র শেষের দিকে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন। ১৯৬১-১৯৭১ পর্যন্ত স্বল্প সময়ে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে অসাধারণ কর্মসম্পাদনা করেন। তাঁর নির্মিত কিছু চলচ্চিত্র:

কখনো আসেনি (১৯৬১), *সোনার কাজল* (১৯৬২), *কাঁচের দেয়াল* (১৯৬৩), *বাহানা* (১৯৬৫ প্রথম সিনেমা- স্কোপ ছবি), *বেহুলা* (১৯৬৬), *আনোয়ারা* (১৯৬৭), *সঙ্গম* (১৯৬৪-পাকিস্তানের প্রথম রঙিন ছবি), *জীবন থেকে নেয়া* (১৯৭০)।

হাজার বছর ধরে (১৩৭১), *আরেক ফাল্গুন* (১৩৭৫), *বরফ গলা নদী* (১৩৭৬), *শেষ বিকেলের মেয়ে* (১৩৬৭) তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। *সূর্য গ্রহণ* (১৩৬২) তাঁর সুপরিচিত গল্পগ্রন্থ।

জহির রায়হানের 'কাঁচের দেয়াল' শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি হিসেবে নিগারসহ একাধিক পুরস্কার লাভ করে। তিনি *হাজার বছর ধরে* উপন্যাসের জন্য *আদমজী* সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। বাংলা একাডেমি ১৯৭২ সালে তাঁকে উপন্যাসের জন্য 'মরণোত্তর সাহিত্য পুরস্কার' প্রদান করে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধী সংঘ আলবদর বাহিনীর শিকার বড়ো ভাই শহীদুল্লা কায়সারকে খুঁজতে গিয়ে ঢাকা থেকে খ্যাতনামা এই চিত্রপরিচালক ১৯৭২-এর ৩০শে জানুয়ারি নিখোঁজ হন। তাঁর লাশও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

প্রতিবেদন: নাসরিন নিশি